বাঁশের ফুল

লীলা মজুমদার

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী। কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬, কলেজ রো,
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রক :
শীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

অন্তরা

ডাক্তার উমানন্দ রায়কে উর্মি ডেকে পাঠাবামাত্র তিনি রওনা দেবেন। এতে তাঁর আধাবয়সী ছেলে বিমানের আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে বোঝা গেল না। এইসব পাহাড়ে পথকে উমানন্দ তাঁর হাতের তেলোর মতো চেনেন, এখানে তাঁর কোনো বিপদ হতে পারে না, একথা বিমানকে কে বোঝাবে। বিপদ যখন আসবে, তাঁর ঐ নিচে স্প্রিং-বসানো ওপরে গদী-মোড়া আখরোট গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী বিলিতী দোকানের খাটেই আসবে। কে না জানে যে শতকরা নব্বুই জন লোক নিজেদের বিছানাতেই মরে। তাই যদি হয় তা'লে তো রাতে শোয়াই বিপজ্জনক। বিমান আবার প্রব্যাবিলিটির কথা বলছিল, উমানন্দর বয়স নিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স কপচাচ্ছিল। দিয়েছেন একখানা মোক্ষম উত্তর। উর্মির বাড়িতে পায়ে হেঁটে যেতে যে তেতাল্লিশটা সিঁড়ি আর গজ পঞ্চাশেক হাঁটতে হয়, তাই করে গত একশো বছরে কটা লোক মরেছে? সেই ডে-টা থেকে হিসেব করে বলুকতো বিমান, তা হলে এই একটা সকালে কটা লোকের ওখানে মরার সম্ভাবনা আছে? তা ছাড়া উনআশী কি এমন বয়স?

উত্তর দিতে পারে নি বিমান। মুখ হাঁড়ি করে বসেছিল। কাছে পেত্‌নিটাও নেই যে তাই দেখে চারটি হেসে দেবেন উমানন্দ। কি যেন একটা বলত পেতনিটা—আমরা তিনটে খেদানো কুকুর, পাহাড়ের গুহায় বসে বসে নিজেদের ক্ষত-স্থান চাটছি! পেত্‌নিটার জন্য উমানন্দর যে এত মন কেমন করে তার কি ব্যবস্থাটা করেছে বিমান? না হয় কুন্তী একটু অকালেই মারা

গেছে; উমানন্দর স্ত্রী অর্থাৎ বিমানের মা-ও তো অকালে মারা গেছিল। অবিশ্যি তার পরে এতকাল কেটে গেছে যে আজকাল উমানন্দর নিজেকে বেশ অবিবাহিত অবিবাহিত লাগে, বিশেষকরে পেত্‌নিটা চলে যাবার পর থেকে যাই হোক, উর্মির কাছে যাবেন নাই বা কেন উমানন্দ, হাঁটা পথে এই তো বেশ যাচ্ছেন।

এক কালে বিমানও অগুনতিবার যাওয়া আসা করেছে এই পথে। ছুটি পেলেই উমানন্দ এখানে এসেছেন, প্রাণের বন্ধু অসিত ঘোষ চৌধুরীর কাছাকাছি কিছুদিন কাটাবার জন্য। সুবিধা পেলেই বিমানও সঙ্গ নিয়েছে। উমানন্দ আগে ভাবতেন বুঝি অসিতের সেই লক্ষ্মীছাড়ি মেয়ে নবীনায় টানে। ভয় পেতেন শেষটা কি হতে কি হবে ভেবে। পরে নিশ্চিত হয়ে ছিলেন, নবীনা ফুরিয়ে যাবার পরও যখন দেখলেন বিমান তখনো ঐ পথে যাওয়া আসা করছে। উঃ, কি বাঁচাটাই না বেঁচেছে বিমান। অবিশ্যি কুন্তীর ওরকম তাড়াতাড়ি মরে যাবার কোনো মানেই হয় না। তবে সে বেঁচে থাকলে আর বিমানকে কিছুতেই বুড়ো বাপের কাছে থাকতে দিত না। বাবাঃ কি মেজাজী মেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি বিমানকে ও কম জ্বালায় নি। পেতনিটা যে তার মেয়ে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে!

এই তো বেশ পাহাড়ের ওপরে পৌঁছনো গেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে একটু দম নেওয়া যাক। একবার বিমান আর উমানন্দ দুজনে দৌড়ে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন। বিমানই বেশী হাঁপিয়ে ছিল! হাঁপ ধরলে মুখ খুলতে হয় না তাও জানত না। তখন তার তেরো চোদ্দ বছর বয়স হবে।

উর্মি এখন অসিতের বাড়িতে একা থাকে। অবিশ্যি ঠিক একাও নয়, দূর সম্পর্কের এক এম্ এ পাশ করা সুন্দরী ভাইঝিকে কিছুদিন হল আনিয়েছে। এ দিকেই নাকি মানুষ হয়েছে, এক বছর ধরে ভুগেছে উর্মি; সিমলা থেকে ডাক্তার এসে ওর চিকিৎসা করে।

উমানন্দ আজকাল রুগী দেখেন না; নাকি সবভুলেও গেছেন। বিমানকে উর্মি কখনো ডাকে না।

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নেয় সিমলার ডাক্তার, কিন্তু কোনো সুবিধে করতে পারে না। অর্থাৎ উর্মির কোনো সুবিধে করতে পারে না। যদিও নিজের যথেষ্ট করে নিচ্ছে।

উর্মির বিশ্বাস সে বাঁচবে না সিমলার ডাক্তারেরো সেই বিশ্বাস। বিমান ঘরে বসে বসে—'ভুল চিকিৎসা হচ্ছে, আমি ওকে দশ দিনে সারিয়ে দিতে পারি।' পারে তো সারায় না কেন? কি, না উর্মি তাকে না ডাকলে সে কি জোর করে চিকিচ্ছে করবে স্টুপিড্।

রোদে ভরে ছিল বাড়িটা সেদিন, মাটির টবের বিগোনিয়াগুলো থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছিল। এমন সকালে কেউ মরে যাওয়ার কথা ভাবে নাকি? অথচ উর্মি সারাক্ষণ তাই ভাবে। আজ নাকি উইল করবে সে সিমলে থেকে উকীল এসেছে; উমানন্দ আর রেবতী সাক্ষী থাকবে; রেবতী হল অসিতের পুরানো বেয়ারা মঙ্গলের বিধবা মেয়ে; এখন সে উর্মির আয়া। রেবতীর হাতে কাল সন্ধ্যেবেলা চিঠি পাঠিয়েছিল উর্মি। না এসে উমানন্দ করেন কি বিমানের যত অদ্ভুত কথা!

মনে হল উকীলের বয়স বেশী না। অবিশ্যি বাইরে যেমনি আলো ঘরে তেমনি আবছায়া; অসিতের এই মাঝের ঘরটাতে দিনের বেলাও আলো জ্বালাতে হয়। অসিতের নাকি তাই ভালো লাগে, বেশ একটা কোচি কোচি ভাব। মনে করেও হাসি পাচ্ছিল উমানন্দর। ভালো স্বাস্থ্য ভালো চেহারা বলে ভারি গর্ব ছিল অসিতের। উমানন্দকে টিটকিরি দিয়ে; ঠাট্টা করে গিরগিটি বলে ডাকত। অথচ সে-ই কবে মরে ভূত হয়ে গেছে আর উমানন্দ রায় এখনো দিব্যি চরে বেড়াচ্ছে।

কিছু বলছিলে নাকি, উর্মিমা? উর্মি আজকাল একটুতেই চটে যায়; খিট্ খিটে স্বরে বলল বলছিলাম বই কি, কি অত ভাবছিলেন কাকাবাবু?

ভাবছিলাম যে অসিতের ঐ রকম স্বাস্থ্য, অথচ তার ছেলে তোমার স্বামী 'কিশোরটার অমন লিকপিকে চেহারা ছিল কেন ?'

উর্মি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'স্রেফ্ মদ আর মেয়ে মানুষ করে, আবার কেন ?' উমানন্দ ভুরু কুঁচকে বললেন, ছিঃ ওসব বিশ্রী কথা মুখে আনতে হয় না।' 'সে করতে পারল ; আপনারা কেউ ঠেকাতে পারলেন না; বাজে একটা জায়গায় গিয়ে মারামারি করে মল আর আমি বললেই যত দোষ ?'

উকীলটি এবার গলা খাঁকরে বলল, 'তাহলে আর মিছিমিছি দেরী করা কেন, সইগুলো হয়ে থাক। আপনার আয়াকে ডাকি ?'

উমানন্দ বললেন, 'তার চেয়ে তোমার ভাইঝিকে সাক্ষী রাখলে ভালো হত না উর্মিমা ?'

উকীল বললে, 'না, না, তা কি করে হবে ? সম্পত্তির বেশির ভাগটাই যে তিনি পাচ্ছেন ; ওয়ারিশ কখনো সাক্ষী হতে পারে না ; হলে উইলটাই বাতিল হয়ে যায়।'

উমানন্দ তো অবাক্ ! 'সে আবার কি, তোমার ভাইঝিকে দেবে অসিতের সম্পত্তি ? তাই কি ভালো হবে ?'

উর্মি তার কৌচে হেলান দিয়ে বসে ক্লান্তির চোটে চোখ বুজে বলল, 'দেবার মতো আর কে আছে, কাকাবাবু ? এখানে যারা যারা আছে, যাদের কাছে আমি এতটুকু ঋণী, সবার নাম দিয়েছি। আপনার নামও আছে। না হাসবেন না, কাকাবাবু, আমার আর বেশি দিন নেই। বাপের বাড়িতে এক ঐ জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মেয়ে ছাড়া কেউ বাকি নেই।

আর এদিকে তোমার ঝেড়ে পুঁছে সাবাড় !

উমানন্দ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'না, তা হবে কেন তোমার ননদ নবীনা মরে গেছে বটে, কিন্তু তার তো এক মেয়ে আছে। তা হলে আর ঝেড়ে পুঁছে সাবাড় বলা যায় না।

পাশের ঘরে সিমলার ডাক্তারটিও ছিলেন, উর্মির চাপা আর্তনাদে

ছুটে এলেন। এ বাড়িতে এঁর ভারি প্রতিপত্তি এই উকীল উনিই ঠিক করে দিয়েছেন নাকি সিমলার ডাক্তারের যেমন, উকীলেরো তেমনি পসার জমেছে।

ডাক্তার হয়তো পাশের ঘর থেকে সব শুনছিলেন। এসেই উমানন্দকে বকতে লাগলেন, 'আহা, পেসেণ্টকে অত উত্তেজিত করতে হয় কখনো? মিসেস্ ঘোষ, দেখি হাতটা।' উর্মি তাঁকে মেরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, উইলটি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। উকীল উমানন্দের দিকে ফিরে বলল।

'এ রকম একটা অপ্রত্যাশিত খবর প্রমাণ করতে না পারলে তো আমরা মেনে নিতে পারি না।'

উমানন্দ হাসলেন, 'প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়।'

উর্মি বলল কাল নতুন উইল তৈরী করবেন উকীলবাবু, আজ আমি বড় ক্লান্ত। কি রকম হাসি পাচ্ছে অনেকদিন পরে।

উর্মি তারপর এতক্ষণ ধরে এত বেশি হাসতে লাগল যে ডাক্তার সাহেব তাকে একটা ইন্‌জেকসন দিতে বাধ্য হলেন। উর্মি ঘুমুলে পর উমানন্দ বাড়ি গেলেন।

আজ কোন দিকে সূর্য্য উঠেছিল কে জানে ক্লাস সেরে এতটা মেঠো পথ ঠেঙ্গিয়ে পার হয়ে ঘরে ঢুকেই সুমতি দেখে হ্যাপা জানলায় আ। ধোয়া নতুন হলুদ কাপড়ের পরদা টাঙাচ্ছে, ঘরময় তার কোরা গন্ধ ভুর ভুর করছে। পূর্বের জানালার ধারে বরুণার খাটে হলুদ সুজনি পাতা দেখে সুমতির আর বুঝতে বাকি রইল না কার প্ররোচনায় নতুন হলদে পর্দা কেনা হয়েছে।

এমনি করেই রাজ্য যায়, রাজত্বও যায় এখানে এসে অবধি এক নাগাড়ে তিন বছর এখন যেটা বরুণার খাট, তার উপর পাশাপাশি টিনের ট্রাঙ্কটা আর ছোট সুটকেস রেখেছিল। আর কোণের খাটে এক দিকে বই খাতা, অন্য দিকে ছাড়া কাপড়। আলনাতে শুধু কাচা কাপড় তোয়ালে গামছা থাকত। এসব বিষয়ে তার একটু

মানামানি আছে ; অন্য লোকে তাকে ছুচিবাই বলতে পারে, তাতে সুমতির কিছু এসে যায় না। এখন ওসব সুখ ঘুচেছে।

ছুচিবাই বলতে পারে মানে সত্যি বলেও থাকে। বরুণাই অষ্ট প্রহর বলে। নিজের ছাড়া কাপড় ভাঁজ করে তোষকের তলায় গুঁজে রাখে আর সুমতিকে নিয়ে হাসাহাসি করে। সুমতি সর্বদা ঘরের বাইরের ছোট প্যাসেজে বাইরে পরার চামড়ার চটিগুলো রেখে, ঘরে পরার মখমলের চটি পরে। বরুনার ঘর আর বাইরেতে কোন ফারাক নেই। সারা জীবন বাইরের লোকের সঙ্গে মাখামাখি করে সুমতির বাইরের লোকের উপর বড় ঘেন্না।

সঙ্গে সঙ্গে একটা খুটখুট খিল খিল শব্দ ; বরুণা এসেই চটিজোড়া পা থেকে ছুঁড়ে খুলে ফেলে নিজের খাটে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসির চোটে একেবারে এলিয়ে গেল। তাঁর বেঁটে বেঁটে কোঁকড়া কালো চুলগুলো আথালি পাথালি হয়ে উঠল, ফরসা মুখের রঙ লাল হয়ে উঠল, চোখদুটো থেকে আলোর ছটা বেরুতে লাগল।

'ওরে হ্যাপা, এক গেলাস জল দেরে আর আমার বিস্কুটের টিনটা বের কর দিকিনি আজ বোধহয় চা-কা খাওয়া হবে না এখানে, দেখে এলাম বিনিপিসি যুদ্ধে নেমেছেন।'

হ্যাপাও তাই শুনে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে জল আনতে গেল। ঝি চাকরের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুনলে সুমতির পিত্তি জ্বলে যায়, কিন্তু সে মাত্র বি এ পাশ, পড়ায় নিচের ক্লাসে আর বরুনা এম এ পাশ ও কলেজের অধ্যাপিকা তা সে যতই না খুকিমি করুক এদিকে রাগও ধরছে, ওদিকে কৌতূহলও চেপে রাখা যাচ্ছে না।

তাই সুমতি শুধোল, কি নিয়ে যুদ্ধ 'অত কি আর শুনতে পেয়েছি নাকি, পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখে এলাম মহিলা সমবায়ের উঠোনে দাবানল লেগেছে 'কার সঙ্গে যুদ্ধ' ?

কে জানে, মনে তো হল মিসেস সমাদ্দারারের সঙ্গে। ওরে হ্যাপা, গেলাসটা না ধুয়েই জল আনলি নাকি, মেছো মেছো গন্ধ পাচ্ছি যেন ?

সাধে তোর বিয়ে হয়নি, হ্যাপা তো অবাক। 'বিয়ে হয় নি আবার কি বরুণাদিদি? তোমার যেমন কথা। সাত বছর বয়সে আমার বিয়ে হল, মা কণ্ঠি দিল, বাউটি দিল, সিঁথি দিল. চরণ পাশে দিল, চারগাছি করে মল দিল, রূপো দিয়ে গা মুড়ে দিল, তবু কিছু হল না।

সুমতি বিরক্ত হয়ে বলল 'হল না আর কি? হ্যাপা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলল, 'বিয়ে তো হল।' ভালোবাসা হল, বিয়েও ভেঙ্গে গেল।' বরুণা উঠে বসে বলল 'সে আবার কিরে? ভালোবাসা হলেই তো বিয়ে হয়।' হ্যাপা হাসতে লাগল, 'উইতো, দিদি। বিয়ের দশ বছর বাদে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। কোথাকার একটা বেজাতের মেয়েকে সাদী করে এখন নতুন হাটের ওদিকে ছেলেপুলে নিয়ে সুখে ঘর করছে।'

'খুব সুন্দরী বুঝি সে?'

'না গো, কালো, হট্‌কা, সিরিপা, এই এত বড় বড় দাঁত সব বেরিয়ে আছে, উট্‌কপালি, মাথায় চুল নেই, ক্যান্ ক্যান্ করে ঝগড়া করে'—তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, 'তাকেই ভালোবাসলে। কিন্তু ট্রেণের সময় কখন পার হল, সে দিদিমণি তো এল না। তোমার বাক্স প্যাঁটরা খাটের তলায় রাখতে বলেছে মা। ঐ বোধহয় মা এল, চায়ের জলটা দেখি।'

সুমতি এতক্ষণে লক্ষ্য করল তৃতীয় খাটের তোষক পাতা। সুমতির বাক্স খাটের নীচে! গাল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। নিঃশব্দে আলনার সব চেয়ে উপরের তাক থেকে নিজের তোয়ালেটি নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে গেল। বরুনার অত হাত মুখ ধোয়ার বালাই নেই, সে চায়ের টেবিলে বসে গেছে।

বিনিপিসির বয়সের পক্ষে চেহারাটা কিছু মন্দ নয়, যদিও গালের ঠিক মাঝখানে আর নাকের ডগায় আধুলি পরিমাণ জায়গা সদাসর্বদা লাল টুকটুক করে। এখনো বেশ রাগত অবস্থা।

এসব লোকের সঙ্গে কি করে পারা যায় বলতো, বরুণা? আশালতাই বা কেমন ধারা মেয়ে তাই ভাবি। সব খুলে লিখেছিলাম তাকে। তিনজনায় একসঙ্গে এক ঘরে থাকবে, একা লাগার বা ভয় পাবার কথাই থাকবে না। সকালে চা রুটি মাখন কলা; দুপুরে ভাত ডাল তরকারি, মাছ পেলে মাছ, অম্বল; বিকেলে যা হয় একটা ভালো জলখাবার, রাতে রুটি কি পরটা, তরকারি, ডিমের ডালনা কি মাংস। এই আমি দেব; তার উপর যার যা ইচ্ছা, নিজে কিনে খাও। তবে রাত দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। আর পুরুষ বন্ধু এলে বাইরের চাতালে বসাবে। কি এমন অন্যায় লিখেছি, তাই বল?"

বরুণা ছলবলিয়ে উঠল 'নিশ্চয়। মিসেস্ সমাদ্দার ওকে ভাগিয়ে নিয়েছে বুঝি?' বিনিপিসির নাক দিয়ে ফোঁস করে খানিকটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

'ভাগাবে কি করে? কোন ভদ্র লোকের মেয়ে টিকতে পারে নাকি তেজু সমাদ্দারের বিধবার বাড়ীতে। তাছাড়া ও ব্যাটা ছেলে ছাড়া কাউকে থাকতে দেয়ও না। বলে নাকি মেয়েরা ঘোঁট পাকায়; আমাকে ইঙ্গিত করেই বলে নিশ্চয়। আর শুধু আমাকে কেন, তার মানেই হল, তোমাদের সুদ্ধু বলা। হ্যাঃ!'

বরুণা বললে—'তবে আশালতা গেল কোথায়?'

বিনিপিসি চা ঘুঁটতে ঘুঁটতে বললেন 'যেখানে খুসি যাক গে। সমাদ্দার তো বলছে ও কিছু জানে না। এদিকে জগদীশরা তাকে ট্রেণ থেকে নামতে দেখেছে, নাকি ভারী রূপসী অথচ সে এখানে পৌঁছয় নি। উষারাণীকে সন্দেহ করব না তো কাকে করব বল, নিশ্চয় আমার নামে যা তা লাগিয়ে দিয়েছে তাকে ভড়কে! ওর অসাধ্য কিছুই—

কথা শেষ না হইতে প্যাঁ পোঁ করে ছুটো রিক্স এসে গেটে দাঁড়াল আর বছর পঁচিশের এক সুন্দরী ও তার এক চাঁই লটবহর নামল।

বিনিপিসির মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, চা পড়ে রইল, ছুটে গেলেন তৃতীয় পেইং গেষ্টকে অভ্যর্থনা করতে। সুমতি একটু কষ্টে হেসে বলল 'আমার খাট বিছানা নিয়ে আমি বাপু বন্ধ বারান্দায় সরছি। বড় ঘরে তোমরা দুজনে সুখে থেকো। বলেই বরুণার মুখের দিকে চেয়ে সুমতি দেখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন, রাগে যেন তার কথা সরছে না। মাখনের ছুরিটা দিয়ে নিজের পয়সায় কেনা অত ভালো আপেলটাকে কুচি কুচি করে কাটতে কাটতে বরুণা বললে 'না, মোটেই না। বন্ধ বারান্দায় আমি যাব।' বলেই উঠে গেল এবং বাইরের বারান্দা থেকে রিক্সাওয়ালারা আশালতার জিনিস বড় ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাপাতে আর বরুণাতে মিলে বরুণার জিনিসপত্র বন্ধ-বারান্দায় তুলে নিয়ে গেল।

সুমতি একটু হেসে, এই সুযোগে নিজের পাতে আরো দু'টুকরো ডিম দিয়ে ভাজা রুটি তুলে নিল আর চায়ের পেয়ালাটাকে বেশি করে দুধ চিনি দিয়ে কানায় কানায় আরেকবার ভরতি করল। নিজের যত্ন নিজে না করলে কে করবে? বারান্দায় বসে বসেই বিনিপিসি আশালতাকে জপাতে থাকলেন। সুমতি নিরিবিলি খাওয়া সেরে, মুখ ধুয়ে বড় ঘরে গেল। বরুণার শূন্য খাটে নতুন হোল্ডঅলে মোড়া আশালতার বিছানা আর কোণের খাটে আশালতার চকচকে নতুন দুটো ঘি রঙের, সুটকেশ আর জিপ্ লাগানো গোল একটা লাস্টমিনিট ব্যাগ পাশাপাশি সাজানো। খাটের তলায় সুমতির বাক্স প্যাঁটরা। সুমতির দম বন্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু মুখে কিছু না বলে, খাবার ঘর হয়ে রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সটাং মনুদের বাড়ি গিয়ে উঠল।

মনু সব কথা শুনে প্রথমেই খুব খানিকটা বিনিপিসির নিন্দামান্দা করল, মিসেস্ সমাদ্দারের কাছে আগেই কিছু কিছু নাকি শুনেছিল সে। সুমতি বলল তোমার কি মনে হয় বরুণা ওকে আগে থাকতেই চেনে এবং দুজনার মধ্যে ঝগড়ার সম্বন্ধ।

মন্টু খুব হাসল। তুমিও যেমন সুমতি দি! ওকি! ও নিমকিটা ফেলে রাখলে কেন? বিনিপিসি কত খেতে দেয় সে আমার খুব জানা আছে, এজন্য থাকি নি ওখানে একমাস এ কোয়াটারটা পাবার আগে! তবে বরুণার ওটা স্রেফ হিংসে। তুই সুন্দরী কি কখনো এক ঘরে থাকতে পারে? তুমিও যেমন, হত আমাদের মতো কেলেকেষ্ট, দেখতে কেমন গলায় গলায় ভাব জমে যেত।'

দুঘরের কোয়াটারটিকে বেশ সাজিয়েছে মন্টু, লাল পর্দা, ইজি চেয়ারে মোড়াতে লাল কুশন, বেশ দু' পয়সা খরচ করে তার ঢাকনির ওপর মহিলা সমবায় থেকে গুজরাটি কাজ করিয়ে নিয়েছে, দেয়ালে ছবি টাঙিয়েছে, তাকের ওপর ভালো ভলো বই, নিচু শ্বেত পাথরের জলচৌকির উপর লম্বা কালো ফুলদানিতে দুছড়া রজনীগন্ধা। একা থাকে; কার জন্য এত সাজায় মন্টু তাই বা কে জানে। ভালো দার্জিলিং চা কেনে, নিজের হাতে নিমকি ভেজে টিনে ভরে রাখে কেউ এলে খাওয়ায়।

অথচ মাইনে তো পায়, সুমতির চেয়ে সামান্যই বেশি; সবটাই হয় তো খরচ করে বসে থাকে। সুমতি কোনো মতেই মাসে একশো দশ টাকার বেশি খরচ করতে রাজী নয়, বাকিটা ব্যাঙ্কে তোলে! কিছু কিনতে-টিনতে হলে আলাদা কথা।

ফুল গাছ লাগিয়েছে মন্টু, আবার লাউ কুমড়ো লঙ্কা বেগুন সব হয়েছে। এত ঝামেলাও সখ করে ঘাড়ে নিতে পারে। মন্টু গেট অবধি এগিয়ে দিল।

শেষ মুহূর্তে আবার হাত ধরে টেনে বলল, 'তাই বলে যেন স্বপ্নেও মনে কর না সুমতিদি যে আমি সমাদ্দারের সাপোটার। নীলকণ্ঠর কথা মনে নেই তোমার?

অবাক হয়ে সুমতি তাকিয়ে থাকে। মন্টু বিরক্ত হয়ে ওঠে—'ওমা, প্রায় অন্তুতঃ দুবার করে এসে যার রান্না খেয়ে গেছ, এরি মধ্যে তার নামটাও ভুলে গেলে নাকি সেই আমার দ্রৌপদী ছোকরা,

মিসেস সমাদ্দার যার রান্না খেয়ে তোমার সামনেই প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ হল। আর সত্যি কথা বলতে কি তোমারো এতে যথেষ্ট হাত ছিল, তুমিই না মুক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলে নীলকণ্ঠর মতো লোক হয় না, শুধু যে অপূর্ব রাঁধে তা নয়, এক পয়সা হিসাবের এদিক ওদিক করে না, এক দানা জিনিস নষ্ট করে না, হেনাতেনা কত কি! আমি তখনি জেনেছিলাম সুমতিদির মুখে আমার রাঁধার লোকের এতটা প্রশংসা কেন? পরে বুঝলাম সবই।'

সুমতি বাস্তবিকই এমনি আশ্চর্য হয়ে গেছিল যে মুখে এতক্ষণ কথা জোগায় নি। এবার আর পারল না, ঝাঁঝালো সুরে বলল, 'তোমার কথার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে মনু, যা মুখে আসে তাই বল। এই নিয়ে কি করে শিক্ষকতা কর বুঝি না। আর তাই যদি বল নীলকণ্ঠকে মাইনে দিতে পঁচিশ টাকা উদয়াস্ত খাটাতে আর দিনান্তে পাঁচশোবার জবাব দিতে। কেন চলে যাবে না সে? উষাদি ওকে চল্লিশ টাকা দেয় আর মাথায় করে রাখে। তার ফলে ওর বাড়িতে সে পেইং গেষ্ট হয়ে সে আর কোথাও যেতে চায় না! অথচ বিনিপিসিকে ছেলেধরা দিয়ে গেষ্ট ধরতে হয়।'

উত্তেজনার চোটে কখন যে মনু সুমতির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিনিপিসির বাড়ী অবধি পৌঁছে গেছে দুজনার মধ্যে কেউই খেয়াল করে নি। বিনিপিসি আর আশালতা চাতালে বসে। তখনো বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। কিন্তু মেজাজ মনে হল বেশ ভালোই ডেকে বললেন 'কি অত আলোচনা হচ্ছে দুজনার মধ্যে? মনে হল যেন বিনিপিসির নাম শুনলাম?'

মনু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সুমতি ওর হাতটা মোক্ষম চেপে ধরাতে, শুধু বলল 'না, কিছু না। আচ্ছা, গেলাম।'

মনু চলে গেলেই বিনিপিসি আশালতার দিকে ফিরলেন—যা তোমাকে বলছিলাম' ঐ উনি হলেন আরেকজন, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না' অথচ ওর হাঁড়ির খবর কে না জানে? ঐতো বেহারার

ছিরি পয়সা কড়ির লোভ দেখিয়ে যদি বা একটি বরকে রাজী করাল, বাপ, সেও পাকাদেখার পর ভেগে পড়ল। অগত্যা বিয়ের টাকা দিয়ে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরিতে ঢোকানো হল। এরকম শুনেছ কখনো, আশালতা কই সুমতি, বসবে নাকি? বুঝলে আশালতা, সুমতি আমাদের মেঠো ইঁদুরের মতো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যায়, রূপ নেই তো বয়ে গেল।

হলদে পাতলা শাড়ীখানি একটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে হাসিমুখে আশালতা একবার চাইল, অমনি চারদিক আলো হয়ে উঠল।

ঠোঁট দুখানি শক্ত করে চেপে সুমতি বললে—নাঃ, বসব না, মাথা ধরছে। বুকের উপর যেন বিশ মণ বোঝা চেপে বসেছে চোখে পথ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু বড় ঘরে ঢুকেই মনটা কেমন হয়ে গেল, ঘরময় ভুর ভুর করছে কিসের গন্ধ? আশালতা বোধহয় খুব দামী ফরাসী এসেন্স ব্যবহার করে। খোলা জানালা দিয়ে তারার আলো পড়েছে সুমতির খাটে। বালিশের ওপর একগোছা কামিনী ফুল কে সাজিয়ে রেখেছে?

সুমতি আস্তে আস্তে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। মনের সব গ্লানি এক নিমেষে কেটে গেল। তারার আলো আর কামিনী ফুল। হাত বাড়িয়ে ফুলের ছড়া ছুঁয়ে দেখে, আঙুলের আগায় সুগন্ধ লেগে থাকে। আশালতা সুমতির বালিশের উপর ফুল রেখেছে। কোথায় পেল সে কামিনী ফুল? আশালতা ঘরে ঢুকতেই সুমতি বললে, আপনি আমাকে ফুল দিয়েছেন?

আশালতা চমকে উঠল, 'ফুল' কই নাতো। 'তবে তো ভুল করে কেউ আমার বালিশে ফুল রেখেছে। আপনার কিম্বা বরুণার ভেবে।' ফুলগুলি তুলে সুমতি গোলটেবিলে রেখে দিল। তবু হাত থেকে বালিশ থেকে ফুলের গন্ধ যায় না।

'আলোটা জ্বালি?' 'ইস, নিশ্চয়। আলোটা ছাড়া গোছগাছ

করবেন কি করে? সুমতি নিজেই আলো জেলে দিয়ে হ্যাপাকে ডাকল, হ্যাপা রান্নাঘর থেকে চ্যাঁচাতে লাগল অমন করলে কিন্তু রাতের রাঁধাবাড়া হবে না দিদি বলে রাখছি। আশালতা হেসে ফেলল। 'থাক না, আমি নিজেই করে নেব, এইতো হাল্কা কাজ কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না আমি বয়সে খানিকটা ছোটই হব।

খানিকটা ছোট নয় আশালতা। সুমতিরো পঁচিশ বছর বয়স। তবে দেখে হয়তো বোঝা যায় না; যাবেই বা কেন? আর সে কথা বলবেই বা কেন সুমতি। হাতে হাতে দুজনায় হোল্ডঅল খুলে বিছানাটা পেতে ফেলল। এদিক ওদিক তাকিয়ে আশালতা জিজ্ঞাসা করল, আরেকজন থাকার কথা না, উনি যে বললেন তিনজন গেস্ট?

সুমতি হাসল, বরুণা পাশের বন্ধ বারান্দায় বোধ করি নিরিবিলিতে থাকতে চায়। কলেজের লেকচার তৈরী করতে হয় কিনা।

আশালতাও হাসল। আরে আমিও তো রিসার্চ করতে এসেছি, অবিশ্যি নিজের পয়সায়। এখানে শুনেছি তিব্বতী পুঁথি আছে অনেক; আমার গবেষণার বিষয়ই হল তাই।'

বেশ মিস্টি গলার স্বর, শান্ত মনে হল মেয়েটিকে; সুমতির ভালো লাগল। আশালতা বাক্স রাখার সমস্যাও মিটিয়ে দিক। প্যাসেজ থেকে পুরোনো বেঞ্চিটাকে হিড় হিড় করে টেনে এনে, তার উপর সুমতির ট্রাঙ্ক বাক্স তুলে দিল। সুমতিকে কিছু বলতেও হল না। আপত্তি করাতে আশালতা বললে, বাঃ বয়োজ্যেষ্ঠাদের জন্য এটুকুও করব না, কি যে বলেন আপনাকে সুমতিদি বলে ডাকতে পারি? সুমতি বললে বরুণাও তাই ডাকে।'

স্নান সেরে আশালতা বললে-'আমি বিনতাদেবীর সঙ্গে রাতে খাবার আগেই রেজিস্ট্রারের বাড়ি গিয়ে কথা বলে আসি, কেমন? চিঠিপত্রে অবিশ্যি সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে, তবু একটু দেখা করা ভালো, কি বলেন সুমতিদি।'

বিনতাদেবী মানে বিনিপিসি। এখানে ওঁর আসল নাম সবাই ভুলে গেছে। সুমতি যখন দীর্ঘ পূজোর ছুটি বোর্ডিংএ কাটাত, তখন বিনতাদেবীর কাছ থেকে প্রতি বছর একখানি সাড়ি পেত। মিস্ বিশ্বাসের কাছে শুনেছিল বিনতাদেবী ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। উনি ছাড়া আর কোনো আত্মীয় স্বজনের কথা শোনে নি কখনো সুমতি। পাশ করে কয়েক বছর এখানে ওখানে কাজ করার পর, ওঁর চেষ্টাতেই এখানকার চাকরির খবর পেয়েছিল সুমতি। সেও আজ প্রায় চার বছর হল। এখানে এসে বিনিপিসির সঙ্গে প্রথম দেখা। এসে বোর্ডিং এই উঠেছিল; সেখান থেকে বিনিপিসি তাকে এক বছর বাদে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। কারো দয়া নেবে কেন সুমতি, এককালে অনেক দয়াই নিতে হয়েছিল। তাই ঠিক হল নিজের লোক যখন,—তা তে যত দূর সম্পর্কের হোক না কেন —আশী টাকা দেবে মাসে সুমতি, নিচের ঘরে থাকবে, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া। কিন্তু দরকার হলে ওঘরে আরো দু জন পেইং গেস্ট রাখতে পারেন বিনিপিসি।

সবই জানত সুমতি, তবু তিন বছর একা থাকার পর যখন বরুণা এল, কেমন যেন অসহ্য মনে হয়েছিল। তার উপর আশালতা। তবু নিঃসঙ্গ হওয়া খুব ভালো নয়; এতে হয় তো ভালোই হবে। তাছাড়া বিনিপিসির কি যেন কাগজপত্রে অনেক লোকসান গেছে, ঘরে আরো কিছু না এলে বুড়ো বয়সে মুস্কিল হবে।

বরুণা ঝড়ের মতো এসে ঢুকল 'উঃফ্ গেছে নাকি? দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলছ দেখছি! পারেও বটে সুমতি দি। সাজের ঘটাটা দেখলে তো? বয়সটা পঁচশ ছাব্বিশের চেয়ে এক বছর কম হবে না। দেখ একবার ছাড়া কাপড়টা কেমন ফেলে গেল! কে তুলবে ওটি? সুমতি ঠাকরুণ নাকি?

সুমতি বললে—'না, তা কেন? হ্যাপাকে ওযে মাসে মাসে দশ টাকা করে দেবে ওর কাজ করে দেবার জন্য। বরুণা দারুণ চটে

গেল। 'ওঃ, নবাবজাদী এলেন নাকি! কাপড়টি ভাঁজ করার জন্য লোক চাই! নাইলনের সাড়ি দেখেছ? ওর দাম পঞ্চাশের কম নয়! ওকে বলে দিও এখানে ওসব চলবে না। এগুলোকে ইস্ত্রি করতে হয় না, তা জানো? সুমতি হাসল। 'কেন চলবে না? ওতো এখানে চাকরিও নিচ্ছে না, ছাত্রীও হচ্ছে না, নিজের খরচায় থাকবে, রিসার্চ করবে, তার জন্য যা লাগবে তাও দেবে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বরুণা। তারপর গম্ভীর মুখে বলল 'তুমি এ সব বিশ্বাস কর সুমতি দি? দেখে নিও ও একটা স্পাই, নিজের কোনো গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। বিনিপিসির আরো খবর নেওয়া উচিত ছিল। ওর সঙ্গে কি করে থাকি, তাই ভাবছি। দেখে নিও এখানকার জীবনযাত্রা এখন থেকে কেমন বদলে যায়।'

হলও ঠিক তাই। সুমতি দেখে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারল না। চিরকাল এ পাড়ার মেয়েরা অনেক রাতেও কোনো সভা কি নেমন্তন্ন খেয়ে একা হেঁটে ফিরছে, কিছু মনেও হয় নি। বরং ভালোই লেগেছে; পথঘাট গাছপালা বাড়িঘর সব এখানে রাতে ঘুমোয়। এ জায়গা কৃষ্ণপক্ষেও অন্ধকার হয় না, তারার আলোতে ফুট ফুট করে; সদর রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথে কেউ নামলেই নেড়ি কুত্তোর দল জানান দেয়। ওদের নিরন্তর সতর্ক প্রহরা। ওদের বোধ হয় এলাকা ঠিক করা আছে, না জানিয়ে একজনের টহল থেকে আরেকজনের টহলে কারো যাবার উপায় নেই।

অথচ পরদিনই সমবায়ের মিটিং সেরে রাত সাড়ে ন'টায় বিনিপিসি খাবার ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চেয়ারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বুকটা হাপরের মতো উঠছে পড়ছে, মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, হাত দুটো পাতার মতো কাঁপছে।

এ বাড়ির নিয়ম সাড়ে ন'টার পরে কারো জন্যে অপেক্ষা করা হবে না, বিনিপিসির জন্যেও না। বিনিপিসি নিজেই এই নিয়ম করেছেন। টেবিল ঘিরে সুমতি, আশালতা, বরুণা বসেছে, হ্যাপা

গরম খিচুড়ি, বেগুনভাজা, আলুর দম ঠোঙায় করে টেবিলে নামিয়েছে। আজ সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে মাছ মাংস পাওয়া যায় নি, ডিমওয়ালা আসে নি।

বিনিপিসির চেহারা দেখে সবার চক্ষু চড়কগাছ, যার সাহসের খ্যাতি প্রায় ঐতিহাসিক, তার আজ কি হল? ক্ষীণকণ্ঠে বিনিপিসি বললেন—'এক বার বাইরে দেখ কেউ আমার পিছন পিছন এসেছে কিনা।' ওরা চারজনে তখুনি দরজা খুলে চাতালে দাঁড়াল। মেঘ কেটে গেছে, আকাশে একটু চাঁদের টুকরো দেখা দিয়েছে, বাদুড় উড়ছে, গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। চারদিক এত নিস্তব্ধ যে দূরে ডাক্তার সেনগুপ্তর বাড়ী থেকে টাইপ রাইটারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সামনে খোলা মাঠ পড়ে রয়েছে, এখানে ওখানে দুএকটা মনসা গাছ, বুনো ফুলের ঝোপ, কোনো মানুষ বা জানোয়ারের চিহ্ন নেই, নেড়ি কুত্তোরা পর্যন্ত বাদলা সন্ধ্যায় যে-যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছে। এক ঝলক ভিজে বাতাস এসে বুক ভরে দিল, গেটের পাশের মাধবী লতাটি চারিদিকে মধু ছড়িয়ে দিল। এমন রাতে কারো ভয় পাওয়া উচিত নয়।

ততক্ষণে বিনিপিসি অনেকখানি সামলে নিয়েছেন। চোখে মুখে জল দিয়ে নিজের কুশন-পাতা হাতল দেওয়া পুরোনো কাঠের চেয়ারে বসে বললেন—'আসছিল কেউ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবটা আর আমি কিছু কল্পনা করি নি। বড় রাস্তার ভিজে পিচের উপর তার পায়ের শব্দও শুনেছি, পথের ধারে ঝোপ ঘেঁষে চলছিল, দেখতে পাই নি; তাই আমি চললে সেও চলে, আমি থামলে সেও থামে। চারিদিকটা কি বিষম চুপচাপ, আমি কি ভয়ঙ্কর একা। যেই বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলাম, সে-ও একটা ছোট দৌড় দিয়ে বকুল গাছের পেছনে লুকোল ছায়ার মতো, নিজের চোখে দেখলাম আমি। এখন তোমরা নেই বললেই তো আর সে নেই হয়ে যাবে না।'

হ্যাপা বলল—উঃ মা! দরজাটা খোলা রাখার কি দরকার গা!

সুমতি সাহস দিতে লাগল—'সে লোকটাও হয়তো ভয় খাচ্ছিল, তারো একা একা লাগছিল।'

বরুণা হাসবার চেষ্টা করে বললে—আপনার আর কি ভয় বিনিপিসি, সুন্দরী তরুণী হলে না হয় ভয়ের কারণ ছিল।'

কিন্তু বিনিপিসির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে তারও মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, সে-ও থামল।

আশালতা বললে—'দরজায় দুটো করে ছিটকিনি লাগানো, জানলায় শিক বসানো, এ বাড়িটা একেবারে নিরাপদ।'

বিনিপিসি নাক দিয়ে ফোঁস করে খানিকটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—'তা বল না, ঐ যে মানিকতলাতে জোড়া খুন হয়েছিল, সে তো গরাদের ফাঁকে স্ক্রুপ্ যন্ত্র দিয়ে শিক বেঁকিয়ে লোক ঢুকেছিল।'

সুমতির স্বরে কোনো ভাবলেশ নেই। 'খুন তো হয়নি পিসিমা, শুধু জখম হয়েছে। বরুণা বললে—'জখম হওয়াতেই বা মজা কত, সুমতিদি?'

আশালতা শিউরে উঠল।—তার পরেই হেসে বলল 'উঃফ্, আপনাদের কথায় গায়ে কাঁটা দেয়! আমি জানলা বন্ধ করে শোব কিন্তু, সুমতিদি'। ভয় পেতে সুমতি রাজী নয়, এমন ভালো খাওয়াটা কেন মিছি মিছি নষ্ট হতে দেবে। আশালতা গাওয়া ঘিয়ের শিশি এনেছে, তার মুখের ঢাকনিটি খুললেই যেন ছায়ায় ঢাকা গোয়ালঘর দেখা যায়, লাল গোরুর প্রসন্ন ডাক শুনতে পাওয়া যায়।

বিনিপিসি একটু অন্য মনস্ক। খাওয়ার পর হ্যাপাকে বললেন 'তুই আজ আমার ঘরেই শুবি। ও সুমতি, দরজা জানলাগুলোর ছিটকিনি ভালো করে দেখে, তবে শুতে যেও। আমার পা কাঁপছে, আমি ঘরে গেলাম।' সুমতি সঙ্গে গেল, ব্যাগ নিয়ে এসে গরম জলে ভরে, বিনিপিসির পায়ের কাছে দিল।

সিঁড়ির আলোটা জ্বালাই থাক সুমতি, হ্যাপা এসে নিবিয়ে দেবে। জানলার ছিটকিনিটা দেখে যেও। দোতলার এই একটি ঘর, একটা স্নানের ঘর আর খোলা ছাদ। ছাদটা ছায়ায় ভরে থাকে। সুমতি দরজা খুলে একবার ছাদে ঘুরে এসে দুটো ছিটকিনি আর হুড়কো লাগাল! আসলে কোনো ভয়ের কারণ নেই, পিসিমা, যারা খোলা খুলি পথে হাঁটে তারা কিছু লুকিয়ে ঘরে ঢোকে না।' ঘুম জড়ানো স্বরে বিনিপিসি বললেন—'খুব খোলাখুলি নয় সুমতি।' তার পরেই চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—'বরুণা কি আশালতার সঙ্গে কথা বলে না?'

শান্ত কণ্ঠে স্মিত বললে—'ভাব হয়ে গেলেই কথা বলবে! আচ্ছা গেলাম পিসিমা, আমারো ঘুম পাচ্ছে।'

নিচে বরুণার ঘর অন্ধকার। আশালতা আয়নার সামনে বসে গুণে গুণে চুলে বুরুশ চালাচ্ছে। অদ্ভুত বুরুশটা লম্বা প্লাস্টিকের হাতল দেওয়া গোল একটা ঝুল ঝাড়ার। মতো গোলাপী কুর্তা আর পাজামা পরেছে আশালতা, পায়ে নকল লোমের পাড় দেওয়া গোলাপী চটি। ঘরময় সুগন্ধ। কোল্ড ক্রীম মাখা আশালতার সুগোল বাহু উঠছে নামছে, 'বিরানব্বুই, তিরানব্বুই ওয়ান্ হান্‌ড্রেড। কি জানেন, সুমতিদি, ইংরিজিটাই আমার মুখে সহজে আসে। ছোটবেলা থেকেই মেমদের স্কুলে পড়েছি কি না। মা যদ্দিন ছিলেন, বাড়িতে আমরা ইংরিজি বলতাম।'

সুমতির আয়নার দরকার নেই, সেকেলে বড় খোঁপা থেকে কাঁটা তিনটে খুলে, গোড়ার ফিতে ঢিলে করামাত্র কালো কোঁকড়া চুলের রাশিতে পিঠ ছেয়ে গেল। বুরুষ নামিয়ে আশালতা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর উঠে এসে দু'হাতে দু মুটো চুল তুলে নিয়ে বলল—'রেশমের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। এমন চুল কি ওরকম করে বেঁধে রাখতে হয়?'

এত সুন্দর চুল আমি কখনো দেখি নি।'

ঐ টুকুতেই সুমতির প্রাণটা ভরে উঠল। অনভ্যস্ত আবেগ ঢাকতে গিয়ে জানলার দিকে ফিরে ছিটকিনিতে হাত দিয়েই, অবাক হয়ে চেয়ে রইল। 'কি? কি?' বলে আশালতাও এগিয়ে এল। জানালার উপর ছোট একটা রেশমি রুমালের উপর একটা নিখুঁৎ আধ ফোটা গোলাপ। তার গায়ে এখনো দু ফোঁটা বৃষ্টির জল লেগে রয়েছে। তার সুগন্ধের তুলনা হয় না।

আশালতা রুমালসুদ্ধ ফুলটাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে জানলাটাকে বন্ধ করে দিল। 'এখানে আমাকে কেউ চেনে না, এটা তোমারি জন্য, সুমতিদি, তোমার কোন ভক্ত রেখে গেছে। আমি ছেলেদের কলেজে যখন পড়তাম প্রায়ই আমার ডেস্কের ওপর ঐ রকম ফুল পেতাম।

সুমতিকে এ জন্মে কেউ গোলাপফুল উপহার দেয় নি, সুমতির কালো ঢেউ খেলান চুল দুহাতে কেউ কখনো তুলে ধরে গালে ঘসে নি। সুমতির গলাটা টনটন করে। আশালতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে জামা ছাড়ে, আশালতা ছাড়া জামাটা তুলে আলনায় মেলে দেয়। 'ছুঁয়ো না আশালতা, ঘামে ভিজে জামা।' আশালতা হাসে।

'কি মোটা বিনুনি, সুমতিদি। আমার একটা কুকুর ছিল, তার ল্যাজটা—আচ্ছা একটা ভালো কুকুর রাখলে কেমন হয় ভাই? আমি কুকুর ভালোবাসি।' সুমতিও লুকিয়ে নেড়িকুত্তোদের খাবার দেয়। সুমতি আস্তে আস্তে ফিরে আশালতার মুখের দিকে চাইল। এ রকম মেয়েরা কোথা থেকে আসে। কই, আগে তো দেখেনি সুমতি।

আশালতা পাখা চালিয়ে দিল হেসে বলল, 'পাখার জন্য পাঁচ টাকা বেশি দেব! তবু যাই বল একশো পঁচিশ টাকায় যে এত সব হতে পারে, এ আমার চিন্তার বাইরে ছিল।'

'একশো পঁচিশ টাকা!' সুমতি চমকে উঠল।

বরুণা দিচ্ছে একশো, আর পাখার জন্য পাঁচ। সুমতি দেয় আশি, পাখা সে চালায় না। বিনিপিসিকে বোঝা দায়!

কোন কথা না বলে সুমতিকে সুদ্ধ সুমতির খাট টেনে আশালতা পাখার নীচে নিয়ে এল। গাঢ়স্বরে সুমতি বললে—'কেন আমার জন্য এত করছ, আশালতা?'

আশালতা বললে—'বাঃ, তা না করলে যে আমার বাড়ির জন্য মন কেমন করবে! আমার বাবার জন্য সকাল থেকেই যে একটার পর একটা কাজ করতে হয়। এসব না করলে আমার হাত নিশপিশ করে।'

আশালতা লাইব্রেরীতে পুঁথি ঘাঁটতে গেছে; বিনিপিসি মহিলা সমবায়ের সেক্রেটারি; ভোর ছ'টা থেকে বেলা একটা অবধি তাঁর ডিউটি। বাড়ি এসে খেয়ে দেয়ে না শুয়ে পারেন না। এবেলা সুমতির ক্লাস নেই, একরাশি খাতা নিয়ে বসেছে, এমন সময় বরুণা এসে ঢুকল। ওর মুখে আজকাল ঐ এক কথা।

'আচ্ছা, ঐ বুড়োধাড়ী মেয়ের বিয়ে হয়নি কেন?'

'তোমারো তো হয়নি বরুণা।'

বরুণা চটে গেল। 'কি যে বল, কিসে আর কিসে! আমার বয়স তেইশ, আর ওর কম করেও ছাব্বিশ। তফাৎ নেই?'

'হয় তো বিয়ে হয়ে গেছে।'

বরুণা খুশি হয়ে উঠল। তাও হতে পারে। দেমাক দেখে বর সটকান দিয়েছে! কিম্বা হয়তো বিধবা, আরেকবারেক চেষ্টায় আছে। এ জায়গাটার সে বিষয়ে বেশ সুনামও আছে—

সুমতি বলল, তুমি কি সেইজন্যে এসেছ নাকি?'

বরুণা উঠে পড়ল 'আজকাল তুমি কত বদলে গেছ। তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। ঐ সুন্দরীর প্রভাব বুঝি? ভারি ভাব দেখছি।

'তোমার সঙ্গেই বা ওর কিসের ঝগড়া? আগে চিনতে নাকি?'

বরুণা সংক্ষেপে বলে 'না'। বলেই উঠে গেল। সুমতি অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

চায়ের টেবিলে বিনিপিসিকে একটু সন্তুষ্ট মনে হল। কে ঐ চাঁদপানা ছেলেটি, বরুণা?'

'চাঁদপানা ছেলে? ও হ্যাঁ, ও হ'ল মিসেস্ সমাদ্দারের অতিথি। আমাদের সকলের কাল ও-বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন। নাকি হাই টি, রাতে রাঁধতে বারণ করে দিয়েছেন। তাই বলতে এসেছিল।'

শুনে বিনিপিসির রাগ দেখে কে। সেই কথা ওকে দিয়ে বলে পাঠাল নাকি? উষারাণীর যদি কোনোকালে আক্কেল হয়। তা তুমি কিছু মনে কর না, বরুণা, কলেজের অধ্যাপিকা হয়ে এসেছে, কিন্তু তবু একরকম আমারি হেপাজতে রয়েছে, তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য। এখানকার হালচাল এখনো তোমার রপ্ত হয়নি বলেই বলছি, ওসব ছেলেছোকরাদের মোটে আস্কারা দিও না।'

রাগে বরুণার ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল, 'কি বলতে চাইছেন বিনিপিসি? যে ভদ্রলোকের মুখে এমনি নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন মিসেস্ সমাদ্দার, তার সঙ্গে কথা বলা মানে আস্কারা দেওয়া? এ রকম করলে—বিনিপিসি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, আমি তা বলতে চাই নি, বরুণা, তুমি ছেলেমানুষ বলেই—কিছু মনে কর না। সত্যিই তো এম এ পাশ করেছ, কলেজে পড়াও, আমার কিছু বলাই উচিত নয়।'

আশালতা একবার বরুণার একবার বিনিপিসির মুখের দিকে তাকাল। সুমতি বলল, 'উষাদির বাড়িতে আজ থেকেই মহোচ্ছব। ওঁর গুরুদেব এসেছেন। নতুন গেস্টরা নাকি তাঁর শিষ্য।'

বিনিপিসি একেবারে চিড়বিড় করে উঠলেন।

'সেই নেকা আবার এসেছে? পুরুষ মানুষ রঙ্গিন কাঞ্জিপুরী শাড়ী পরে, গলায় লম্বা মফচেন ঝুলিয়ে, দশ আঙুলে দশটা আংটি পরে একপাল মেয়ের মাঝখানে বসে ঢং করবে, আর এঁরা সব

ভক্তিতে গদগদ হয়ে গুরুদেবের পদতলে লুটিয়ে পড়বেন! উঃ! অসহ্য! তা আমাদের কিসের জন্য ডাকা? আমরা তো ভক্ত নই।'

আশালতা বললে—'কে গুরুদেব?' বরুণা আজকাল আশালতার সঙ্গে কথা বলে; অবিশ্যি কথাগুলোতে একটু লঙ্কাবাটা লাগা থাকে। সে বললে—'গিয়ে দেখেই আসুন না, আপনাকে দেখলেই শিষ্যা করে নেবেন। ভারি ভালো দেখতে গুরুদেব, খুব বেশি বয়সও নয়।'

সুমতি বললো 'এখানে তাঁর অনেক ভক্ত আছে, আশালতা। উষাদি বলেন গুরুদেবের দয়াতেই তাঁর দুঃখকষ্ট ঘুচেছে, তাই গুরুদেব এলেই তাঁর এত আদর যত্ন। অবিশ্যি গুরুদেবটি বয়সে ওঁর চেয়ে অনেক ছোট। বরুণা দমবার পাত্রী নয়—'তবে কি আপনি যাবেন না বিনিপিসি? আমরা কিন্তু যাব। খুব ভালো খাওয়া হবে সুমতিদি। এটুকু আমি নিশ্চয় বলে দিতে পারি।' কথাটা বিনিপিসির গায়ে বিঁধল। তবু বললেন—'উষারাণী যেতে বলেছে, না গেলে খারাপ দেখাবে। তা হলে কাল আর মাংস আনাব না। আশালতা তোমার খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?'

বরুণা ঠেস দিয়ে উত্তর দিল। 'তা নিশ্চয় হচ্ছে। ওঁদের বাড়িতে ইংরিজি কথা বলে আর বিলিতী খানা খেয়ে সকলের অভ্যেস।' আশালতা উঠল না। কি জানেন বিনিপিসি, মসুমপুর প্রায় সিমলের সমান উঁচু, ওখানে শীতের চোটেই সবাই সাহেবমেম বনে যায়। কাঁটাচামচে খায়, জুতো মোজা পরে। সন্ধ্যেবেলা বাবা চিমনির ধারে বসে পাইপটা নেন, তখন আমি— এই অবধি বলে আশালতা চুপ করল!

বিনিপিসি বললেন, 'তোমার বাবা ডাক্তার বলেছিলে না? রিটায়ার করা সিবিল সার্জন না? এখানেই বোধ হয় প্র্যাকটিস্ করেন? ওখানে অনেক বাঙ্গালী আছে না?

আশালতা একটু অবাক হল। 'আপনি গেছেন নাকি ওখানে?' বিনিপিসি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'না, না, এমনি শুনেছিলাম।'

'সুমতিদি ওদিকে গেছ নাকি? বড় ভালো জায়গা, শরীর মন দুই-ই ভালো হয়। যেন এ জগতের নয়। একটি রাস্তাতেই দোকান পাট, স্কুল, গির্জে, হাসপাতাল, হোটেল, সব। হাটবাজার করতে হয় না জান? দোর গোড়ায় পাহাড়ী মেয়েরা মিষ্টি মিষ্টি পাহাড়ে মাছ, মুরগী, ডিম, মাংস, ফল, তরকারী, দুধ, মাখন, সব এনে দেয়। আমরা ঘরে বসে সওদা করি।'

বিনিপিসি বললেন—'এখানেও সাত আট বছর আগে ঐ রকম ছিল। আমি সব ঘরে বসে কিনতাম। ধান খেতে ধরা তাজা তাজা কুচো মাছ, জ্যান্ত জ্যান্ত সাদা রঙের চিংড়ি, তাছাড়া ডিম, মুরগী, ফল, তরকারি, আতপ চাল সমস্ত এই চাতালে বসেই পেতাম! এখন সব বদলে গেছে। নেমন্তন্ন না করলে কেউ কারো বাড়ি যায় না, গাঁয়ের লোকেরাও এদিকে আসা বন্ধ করেছে।

অনেকক্ষণ পরে সুমতির মনে হয়েছিল আশালতা কি বুদ্ধিমতী, কেমন অন্য প্রসঙ্গ তুলে অপ্রিয় কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। সুন্দরীরা যদি বুদ্ধিমতীও হয় তাহলে সুমতির মতো কালো মেয়েরা কোথায় যাবে? ভেবে একটু হাসি পেল যাবে আবার কোথায়? ছোট বেলায় সুমতি বোর্ডিংএ থাকত, কোথাও যাবার কথা উঠতই না, ছুটিতেও না। তারো আগে আরো ছোটবেলার কথা মনে করতে চেষ্টা করেছ সুমতি। কোথাও যেন একটা ছোটবাড়িতে থাকত, একজন বুড়ি ঝি ছিল। সেটা নাকি মিস বিশ্বাসের মা ডঃ মিসেস্ বিশ্বাসের বাড়ি। সুমতি জন্মাবার সময়ই নাকি ওর মা মারা গেছলেন, বাবাও ছিল না। তাই আবার কি মা কি মাসি কিছুই মনে পড়ে না। ছোট বেলায় কেউ নাকি খরচ দিত। পড়াশুনোয় ভালো ছিল বলে, একটু বড় হয়েই ফ্রি-তে পড়ত। বড় স্কুলে ফ্রিতে পড়ার বড় কষ্ট। আরো বড় হয়ে স্কলারশিপ পেত সুমতি। কলেজেও

তাই। বি-এ পাশ করেছে, বি-টি পাশ করেছে, কারো সাহায্য চাইতে হয়নি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও পেয়েছে, প্রথম চাকরি কলেজের কর্তৃপক্ষের সুপারিশেই পেয়েছিল, চার বছর আগে এখানে এসেছে। আশালতা আজ সুমতির চুলগুলোকে হাতে নিয়ে গালে ঘষেছে, সুমতির গলার কাছটা টনটন করে উঠেছে। বিনিপিসিও সুমতির জন্য অনেক করেছেন। একা বোর্ডিংএ ছোট মেয়েকে কত উপহার পাঠিয়েছেন যদিও দেখতে যাননি। উনি ছাড়া কে-ই বা আছে সুমতির, কিন্তু বিনিপিসিও কখনো আদর করেননি। সুমতিকে কেউ কখনো আদর করেনি। যে সুন্দর নয়, তার যদি আদরের মানুষ না থাকে, তা হলে কে তাকে আদর করবে?—এই রকম এলোমেলো কথা ভাবে সুমতি।

বাড়িতে এই সন্ধ্যাবেলায় আর কেউ নেই, শুধু খাতার গাদা নিয়ে সুমতি আর রান্নাঘরে হ্যাপা। হ্যাপা একবার চিন্তিত মুখে এঘরে এসে বলল—'শাশুড়ি আমার কাজ করাতে অমত করছে দিদি।'

সুমতি চমকে উঠল অমত করছে আবার কি, হ্যাপা? আর শাশুড়িদের সঙ্গে তোর কি? তোর বর না আবার সাদী করেছে? শুনে হ্যাপা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'সেটা সাদী করেছে বলে তো আর—শাশুড়িরা করে নি? আমার শ্বশুরবাড়ির গুষ্টির মেয়ে বৌরা দরকার হলে মজুরের কাজ করে কিন্তু লোকের বাড়িতে কাজ করলে আমাদের জাত যায়।'

সুমতি বিরক্ত হয়ে উঠল! 'তা হলে তো অনেক দিন আগেই তোর জাত গেছে। আমিই তো তোকে এখানে তিন বছর দেখছি। যা, এখন কাজ কর গে।'

হ্যাপা যেতে যেতে বলল—'মোটেই আমার জাত যায়নি। এখন শাশুড়িরা মানা করছে। খেতে অনেক ধান হয়েছে। খাটতে হলে সেখানে খাটতে বলছে।'

সুমতির ভাবনা হল। হ্যাপাকে ছাড়া বিনিপিসির কি করে চলবে? উঠে সুমতি রান্নাঘরে গেল। 'ও হ্যাপা বিনিপিসিকে ছেড়ে কোথাও যাসনি রে। এই নে ধর, তোকে আমার নতুন জামাটা দিলাম, সেলাই করার সময় খুব চোখ দিয়েছিলে না? সুমতি হাসবার চেষ্টা করে। হাসিঠাট্টা বড় সহজে সুমতির আসে না। ওকি! ওকি! একটা রক্ত-জল-করা বিকট চিৎকারে সন্ধ্যা বেলার আকাশটা চৌচীর হয়ে ফেটে গেল। হ্যাপা ছুটে এসে সুমতিকে জড়িয়ে ধরল। তারপরেই সব চুপ। কি ভীষণ থমথমে চুপ সে কল্পনা করা যায় না। হ্যাপার হাত আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে সুমতি বড় টর্চটা তুলে নিয়ে চাতালে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার সেনগুপ্তর বাড়ীতে টাইপ রাইটারের খট্-খট্ শব্দও থেমে গেল। একটা টর্চ দেখা গেল। সুমতি আর ডাক্তার সেনগুপ্ত এক সঙ্গে বড় রাস্তায় উঠে এলেন। এদিকে আর বাড়ি নেই, পথের দুধারে উঁচু নিচু ভাঙ্গা মাঠ, খেজুর গাছ, বাবলা গাছ ছাতিম গাছ। ছাতিম গাছের নিচে সাদা কি একটা পড়ে আছে। টর্চের আলোতে দেখা গেল মানুষ। বেশি বয়স না, বেঁচে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছেনা, মাথাটা একটা পাথরের উপর পড়েছে, কানের ওপরে জখম হয়েছে, রক্ত পড়ছে, চোখ বন্ধ!

ডাক্তার সেনগুপ্ত সত্যিকার ডাক্তার নন, অবসরপ্রাপ্ত নাম করা অধ্যাপক এখানে নিরিবিলিতে বসে বই লিখছেন। তবে এককালে বয় স্কাউট ছিলেন, এখনো সে গল্প করেন। একটু যেন ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। 'ম-মরে যায় নি তো?' সুমতি বসে পড়ে বুকের ওপর হাত রাখতেই, লোকটা গোঙিয়ে উঠল। ডাক্তার সেনগুপ্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'আঃ বাঁচা গেল! এবার একে দুজনে মিলে ধরাধরি করে আপনাদের ওখানেই নিয়ে যাওয়া হোক, সব চাইতে কাছে হবে। তার পর ডাক্তার বাবুকে ডাকা।'

আহতকে নিয়ে বাড়ির চাতালে উঠতেই হ্যাপার পতন ও মূর্চ্ছা।

বাইরের ঘরের তক্তাপোষে তাকে শোয়ানো, হ্যাপার মাথায় জল ঢালা, ডাক্তারবাবুর কাছে সেনগুপ্তর চাকরকে পাঠানো—এসব করতে করতে বিনিপিসি এসে গেলেন। বরুণাও এল, আশালতাও এল। বরুণার মুখ কাগজের মতো সাদা। হ্যাপা ততক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠেছে মন্তব্য করল 'বরুণা দিদি খুনের মড়া দেখে নি বুঝি?'

বিনিপিসি বললেন—'মরা হবে কেন? পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

হ্যাপা অবজ্ঞার হাসি হাসল, 'তা হলেই তাই মা, ওর জ্ঞান আর ফিরবে না, দেখো।' সবাই চটে উঠল। বরুণা কাঠের পুতুলের মতো বসে রইল, আশালতা একবার ঘর একবার চাতাল করতে লাগল। বিনিপিসি আর সেনগুপ্ত পরস্পরকে সাহস দিতে লাগলেন। সুমতি ফুটোনো জলে ডেটল দিয়ে তাতে তুলো ডুবিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষতস্থান থেকে কাদামাটি ধুয়ে তুলতে লাগল। তারিমধ্যে ডাক্তারবাবু এলেন। সঙ্গে ছোট ডাক্তার। করণীয় সবই করা হল। আঘাত নাকি গুরুতর, ওকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না। বিনিপিসি দুচোখ কপালে তুলে বললেন, 'কি বলছেন সোমেনবাবু, আপনি জানেন এ বাড়িতে কখনো পুরুষ মানুষ রাত কাটায় নি।' সেনগুপ্তর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুও ভিজে হাত মুছতে মুছতে একটু হেসে বললেন—'এবার কাটাবে।'

'না ডাক্তারবাবু, তা হয় না। অচেনা অজানা কোথাকার কে' চেনা হলেও কথা ছিল। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।'

ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর। 'নাড়াচাড়া করতে গেলে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, বিনিপিসি।' কই সুমতি, তোমার তো নার্ভস্ বলে কিছু নেই; চিৎকার শুনে হ্যাপা রান্নাঘরে ঢুকে দোর দিল আর তুমি টর্চ নিয়ে পথে বেরুলে। তুমি ওর দেখা শুনো করতে পারবে

না? নার্স আনাতেও তো দু একদিন সময় লাগবে। তার খরচাই বা কে দেবে? তুমি পারবে না?'

সুমতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

এমন সময় আশালতাও সুমতির পাশে দাঁড়াল। 'আমিও সাহায্য করব, ডাক্তারবাবু।' বুড়ো ডাক্তারবাবু খুসি হয়ে বরুণার দিকে ফিরে বললেন—'আর আপনি?'

বরুণা কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দেখে বিনিপিসির মুখটা হাঁড়ির মত হয়ে গেল, সংক্ষেপে বললেন—'দরকার হলে আমরা সবাই করব, সোমেনবাবু।' আশালতা ততক্ষণে বরুণার মুখে প্রায় এক গেলাস জল ছিটিয়ে দিয়েছে। বরুণা উঠে বসে সবার আগে তার মুখ দেখে আবার চোখ বন্ধ করতেই, আশালতা আরেক গেলাস জল আনল। বরুণা তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক, ঢের হয়েছে।' বলে উঠে বসল।

রাতজাগার জন্য দুটি কলেজের ছেলে পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু, তারা ছোট ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পালা করে রাত জাগবে। খাবার ঘরে সুমতির ক্যাম্প খাট পেতে একজন করে শোবে ঠিক হল; দরকার হলে সুমতিকেও ডাকা হবে।

বিনিপিসির বাড়ির পুরানো নিয়ম একেবারে বদলে গেল, বরুণার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলল। কিন্তু তাতে উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাকুক, বরুণা যেন কি একটা অজানা আশঙ্কায় একেবারে কাঠ। বিনিপিসির বাড়িতে অচেনা আহত লোক উঠেছে, এ কথাটা রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। দলে দলে কৌতূহলীরা দেখতে এল; অবিশ্যি বিনিপিসি কাউকে চাতালের বেশি এগুতে দিলেন না।

তাই নিয়ে পরদিন মিসেস্ সমাদ্দারের চা-পার্টিতে বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ততক্ষণে লোকটিকে খানিকটা সনাক্তও করা গেছে। উষারাণীর গুরুদেবের দলের সঙ্গেই একই গাড়িতে

একই কামরায় লোকটা নাকি এসেছিল। ভক্ত কৌশিক রায় তাকে দেখতে গিয়ে চিনতে পারে। উষারাণীর চা-পার্টিতে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হবে বিনিপিসির বাড়ির আহত ব্যক্তি, এটা কি করে উষারাণী সহ্য করে? গুরুদেবের পায়ের কাছে ধপ্ করে বসে পড়ে —'গুরুদেব, ক্ষমা করুন, আপনার অযত্ন হচ্ছে, অবহেলা হচ্ছে, আপনার দিকে কারো দৃষ্টি নেই।

গুরুদেব স্মিত হেসে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তার জন্য ভাবিস্ কেন, বেটি? যাঁর দৃষ্টি তাঁর দৃষ্টি ঠিকই আছে। ও লোকটার জন্য আমার মায়া হচ্ছে, কি উদ্ধত কি কঠিন! অমনি করেই কি চলে যাবে না কি? শুনে ঘর সুদ্ধ সবাই অবাক। কৌশিক বলল, গুরুদেবের অমনি সবার ওপর দয়া। ও লোকটা অতটা পথ সঙ্গে এল' পায়ের ওপর পা তুলে স্রেফ একটার পর একটা সিগারেট টানতে টানতে। সঙ্গে অত বড় একজন মহাপ্রভু রয়েছেন, ভ্রুক্ষেপও নেই। ষ্টেশনের লোক সত্যিকারের সাধু দেখে পায়ের ধূলো নিতে গাড়িতে উঠছে, আর ও লোকটা প্রণাম করা দূরে থাকুক সারাক্ষণ যেন কি ভেবে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিল। এ সব অপঘাতের পেছনে কারণ থাকে।'

কৌশিকের চাঁদপানা মুখ দেখে মহিলাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। আগের বার তো গুরুদেবের সঙ্গে এ ভক্তটি আসেনি। উষারাণী বললে—গুরুদেবের পাঁচ হাজারের বেশি চ্যালা, সবাইকে এই গরীবের বাড়িতে আনব আমার তেমন সাধ্য কোথায়? গুরুদেব যে গরীবখানায় পায়ের ধূলো দেন, এই আমার যথেষ্ট। ভাবের আতিশয্যে উষারাণী সত্যি সত্যি কেঁদেই ফেলল। বিনিপিসির আর সহ্য হল না, তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এবং বেশ ভালো ভাবেই হয়েছে কাজেই তিনি উঠে পড়লেন। গুরুদেবকে ছোট একটা নমস্কার করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন উষারাণীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। তার মুখটা অস্বাভাবিক রকমের লাল।

'আমাকে এ ভাবে অপদস্থ না করলেই কি চলত না, বিনি ? বিনিপিসি তো অবাক। 'কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না।' 'বেশ পারছ। বলছিলাম যে তোমার সেই আদরিনী গরবিনী সুমতি ঠাকরুণের কি গুরুদেবের কাছে মাথা নিচু করলে জাত যেত ? আর নতুন মেমসায়েব বুঝি গরীবের বাড়িতে খান না ?'

বিনিপিসি অনেক কষ্টে রাগ চেপে বললেন, 'সবই তো জান উষারাণী, বাড়িতে একজন গুরুতর ভাবে আহত রুগী, তার দেখা শুনোর জন্য কাউকে থাকতে হবে না ?'

'সবই বুঝি বিনি, আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছ ?

কলেজের ছেলেরা জোড়ায় জোড়ায় ডিউটি দিচ্ছে না ? তা ছাড়া কোথাকার কে একটা ব্যাটাছেলে, অমনি দুটো মেয়েকে তার কাছে ছেড়ে না এলেই নয় ? সব বুঝি আমি।'

বিনিপিসি চটে গেলেন। 'ছাই' বোঝ। লোকটার এখনো জ্ঞানই হয় নি, ডাক্তারবাবুই তাকে চোখে চোখে রাখতে বলেছেন এর পেছনে অনেক ব্যাপার আছে। এতই যখন তুমি অবুঝ, তখন বলি শোন। ডাক্তারবাবুর মতে এমনি পিছলে পড়ে অমন করে কেউ জখম হয় না। এক যদি না তাকে ধাক্কা দিয়ে কিংবা আছড়ে ফেলা হয়। কিংবা মাথায় ডাণ্ডা মারা হয়। এর শেষ কোথায় দাঁড়াবে কেউ জানে না। হয় তো পুলিসকেস্, খুনের মামলা—'

'না, না, না, না,—' বরুণা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সমস্ত চোখ মুখে অস্বাভাবিক একটা আশঙ্কার ছায়া। 'ও কথা বলবেন না, বিনিপিসি, কেউ ওকে ধাক্কা দেয় নি, এমনি পড়ে গেছে; আমি—' এই অবধি বলে বরুণা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

বিনিপিসি তাকে কোনোরকমে টেনে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। উষারাণী তার টি পার্টির সভ্য সভ্যাদের কাছে ব্যাপারটা কিভাবে রসিয়ে বলবে ভেবে তাঁর গা শিউরে উঠল। পুলিস কেসের কথাটা বোধ হয় না বললেই ছিল ভালো। কিন্তু উষারাণীর

দেমাক একেবারে অসহ্য; ওর বাড়িতে গুরুদেব এসেছেন বলে ধরাখানাকে সরাখানা দেখছে।

অন্য লোকের বাড়িতেও যে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু ঘটতে পারে এটা সে সইতে পারে না। আর বরুণাও লোক হাসাল!

বরুণার উত্তেজনার কোনো কারণ জানা গেল না। কোনো কথাই সে বলল না, থেকে থেকে সশব্দে নাক ঝাড়া আর গলা পরিষ্কার করা ছাড়া কোনো উত্তরই তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

দুজনে যখন বাড়ির চাতালে উঠলেন রাত তখন আটটা বেজে গেছে। আশালতা বসেছিল। তার কাছে শোনা গেল লোকটা একবার চোখ খুলেছে, বোধহয় একটু একটু জ্ঞান ফিরেছে।

পরদিন থেকে বড় সহরের হাসপাতালে ট্রেণড্ করা নার্সের বন্দোবস্ত হল। সে সারাদিন ডিউটি দেবে, রাতে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। বরুণা স্পষ্ট বলে দিল অসুখ বা রুগী বা ডাক্তার বা রক্ত দেখলে তার গা গুলোয়, তার কাছ থেকে কেউ কিছু আশা না করে। অবিশ্যি সেবা করাতে যখন এদের এতই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে ব্যাটাছেলের সেবা এবং কমবয়সী ব্যাটাছেলের, তখন এরা থাকতে তো কোনো প্রশ্নই উঠছে না।

এ কথায় কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। আশালতা অবাক হয়ে দেখছিল চাপা আবেগের চোটে বরুণার পাৎলা নাকের দুপাশের মিহি দেয়াল কেমন সাদা হয়ে ফুলে ফুলে উঠেছে। সুমতিও অবাক হয়ে গেছিল, রুগী যে ব্যাটাছেলে এটা সে লক্ষ্য করলেও, ওর বয়স যে কম এ বিষয়ে অত খেয়াল হয়নি।

বিনিপিসি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে বসলেন, 'আমার দাদা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিল, মাথায় খুব চোট লেগেছিল, অচেনা লোকেরা রাস্তা থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার সেবা করেছিল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল।'

সুমতির মুখে কথা নেই। এই প্রথমে বিনিপিসিকে তার নিজের কোনো আত্মীয়ের কথা বলতে শুনল। বিনিপিসি বলে চললেন, কাল থেকে যে নার্স থাকবে, তার জন্য রাতে শোবার জায়গা দিতে হবে। বরুণা, তোমাকে তা হলে ঘেরা বারান্দাটি ছাড়তে হয়! বড় ঘরে যথেষ্ট জায়গা কিন্তু নার্সকে তো কারো সঙ্গে ঘর শেয়ার করতে বলা যায় না। এরা রাতে উঠবে, রুগীর কাছে যাবে, নার্সের ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।'

বরুণা হাঁড়ি মুখ করে বলল, 'আমারো তো ঘুমের ব্যাঘাত হবে। আমাকেও সারাদিন কলেজে খাটতে হয়।' আশালতা বললে, 'সে তো সুমতিদিকেও খাটতে হয়, আমিও একটু একটু খাটি।'

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বরুণা বলল, 'দেখছি এখানে আমাকে থাকতে দেবেন না আপনারা। আগেই জানতাম, তাই মনুদির ওখানে কথা বলে এসেছি, কাল ভোরে ওঁর বাড়িতে উঠে যাব।'

বিনিপিসির মুখটা থমথমে। সংক্ষেপে বললেন 'সেই ভালো।' সুমতি এত কথার কিছুই জানে না।

ডাক্তার সেনগুপ্ত রেফ্রিজারেটর থেকে বরফ পাঠিয়ে দিয়েছেন চওড়া মুখের ফ্লাস্কে ভরে। তারি কয়েকটা টুকরো গুঁড়ো করে আইস ব্যাগে ভরে লোকটির মাথায় দিতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু। জড়ানো গলায় কি যেন বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছে সে। সুমতি মাঝে মাঝে ও-ডি কলোনে ভিজে রুমাল দিয়ে তার কপাল চোখ, মুখ মুছে দিচ্ছে, গালের ওপর রুমালটা খড়খড় করে উঠছে।

অবাক হয়ে সুমতি দেখছে একদিনে কত পরিবর্তন হতে পারে। একটা মানুষের চেহারার চোখের নিচে কালি, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আশালতা তাই দেখে একটু হেসেছিল। বলেছিল, আমার বাবারো বড্ড দাড়ি। যেদিন সহরে ডিনার পার্টিতে যান, রাতে আরেকবার দাড়ি কামাতে হয়। কারো কারো বড্ড দাড়ি।'

সুমতি তো অবাক। দাড়ির যে আবার বেশ-কম থাকে এ তার ধারণার বাইরে ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সুমতি কখনো খুব কাছে থেকে পুরুষ মানুষ দেখে নি। যে বোর্ডিং স্কুলে সে মানুষ হয়েছিল সেটা ছিল প্রমীলা রাজ্য, ফটকে অবিশ্যি দুটো দরোয়ান থাকত, স্কুলের বেয়ারা ছিল চার পাঁচজন, কিন্তু বোর্ডিংএ তারা কেউ দরকার না হলে আসত না। আসতে ভয়ই পেত দস্তুর মতো।

ভয়ের কারণও ছিল যথেষ্ট; বোর্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস বিশ্বাসের ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। শোনা যায় একবার একটা চোর ঢুকেছিল বোর্ডিংএ, মিস্ বিশ্বাস তার মাথায় এমনি টর্চের বাড়ি কষিয়ে ছিলেন যে সে তক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিল। তার ওপর হেড-মিষ্ট্রেস্ ছিলেন বুড়ি মিসেস্ টমলিন, তাঁর আবার বন্দুক ছিল। রাতে পায়ে ফেলেটর জুতো পরে সারা বোর্ডিং দু তিনবার টহল দিতেন। পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণেও সুমতি অভ্যস্ত ছিল না। অসুখ করলে বোর্ডিংএ লেডি ডাক্তার আসতেন। খুব গুরুতর অসুখ হলে তবে পুরুষ ডাক্তার ডাকা হত। সুমতির নিজের কখনো শক্ত অসুখ হয় নি। বড্ড ভালো স্বাস্থ্য ছিল তার।

একবার স্কুলের প্রায় সকলের জল বসন্ত হয়েছিল; সুমতির হয় নি। আরেকবার টাইফয়েডে অনেক পড়েছিল, দু'জন মারাও গেছিল; সুমতির কিচ্ছু হয় নি। এই প্রসঙ্গে ছোট মেয়েদের যে বিখ্যাত বড় বড় কান্ থাকে, তারি সাহায্যে সুমতি মিস্ বিশ্বাসকে ডাঃ মিসেস তলাপত্রের কাছে বলতে শুনেছিল, 'ওর যে কিচ্ছু হবে না সেটা জানা কথা। ওসব মানুষের কখনো কিছু হয় না, দীর্ঘ দিন বাঁচে।' মিসেস্ তলাপত্র একবার সুমতির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'নইলে দুঃখ পাবে কি করে?' যাবার সময় ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে গেছিলেন আর পরদিন ছোট শিশিতে করে লেবু লজেঞ্চুষ এনে দিয়েছিলেন। বিনিপিসির সঙ্গে

বোধ হয় ওঁর বন্ধুত্ব ছিল। এ বিষয়ে কিছু হয় তো লিখেছিলেন, কারণ সেবার পুজোর জামা পাঠাবার আগেই বিনিপিসি পার্সেল করে সুমতিকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ' পাঠিয়েছিলেন। বিনিপিসিকে বাইরে থেকে যতটা কর্কশ মনে হয়, অন্তরে যে ততটা নন্ তার বহু প্রমাণ পেয়েছিল সুমতি! অবিশ্যি ওকে সর্বদাই ঠেলে ঠেলে দূরে রাখবার চেষ্টা করেন। সেই ভালো, কারো সঙ্গে বেশি জড়িয়ে না পড়াই ভালো, তা হলে মনে কষ্ট পাবারো কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সুমতি কারো কাছ থেকে কিছু চায় না; কেউ সুমতির কাছ থেকে কিছু চায় না। নিজের রোজগার করা টাকা জমিয়ে সুমতি বিলেত যাবে, এই তার গোপন বাসনা। লোকের কৃপার পাত্রী হয়ে থাকবে না সে, ছোটবেলায় অজানা কেউ নাকি ওর বোর্ডিংএ থাকার ও পড়ার খরচ দিত। টাকা দিয়ে ও সব ঋণ মোটানো যায় না, নিজের উন্নতি করে সেই ঋণ শোধ করবে সুমতি। বিনিপিসির কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বিনিপিসির ঋণ শোধ করবে। অবিশ্যি কেউ তাকে কোনো ঋণ শুধতে বলেনি কেউ তার কাছে কখনো কিছু চায়ও নি—অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুমতি। হঠাৎ লোকটার খোলা চোখের উপর চোখ পড়ল।

কেমন একটা বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটা সুমতির চোখের দিকে চেয়ে আছে। চোখের তারা একটু নীলাভ, কিন্তু সাদাটাতে লাল লাল শিরা দেখা যাচ্ছে। তার পরেই গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে সে আবার চোখ বুজে বিড়বিড় করতে লাগল। ছোট ডাক্তার বাবু এলেন, রুগীর অবস্থা দেখে খুশিই হলেন আবার। আবার বললেন, একজন নার্স রাখতেই হবে তাই ব্যবস্থা করেছি। এখন খরচ নিয়ে সমস্যা। অথচ পাশকরা নার্স না হলে এসব কেসে চলেও না, এদিকে নার্সের সাত দিনের কি জমা দেওয়ার নিয়ম। মিসেস্ সমাদ্দার বলেছিলেন,

ওঁর গুরুভাই কৌশিক রায় হয়তো গুরুদেবকে বলে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। উনি নিজে গুরুদেবের সামনে টাকাকড়ির প্রসঙ্গ তুলতে পারবেন না।

সুমতি হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'না, তা হয় না; ওঁরা শুনেছি এঁর ওপর খুব প্রসন্ন নন। যা দেবার আমরা দেব, পরে ভালো হয়ে উনি মিটিয়ে দেবেন।'

'আমরা মানে কারা? বিনিপিসিও দেবেন?' 'দিতে পারেন। তাছাড়া আশালতাও দিতে পারে।' 'ওষুধের দাম কে দিচ্ছে?' সুমতি বললে—'বাকিতে ওষুধ এসেছে, চেনা দোকান। তা ও আমরা মিটিয়ে দেব।'

পরে কথাটা শুনে বিনিপিসি একটু বিরক্ত হলেন। 'মিছিমিছি পরের ঝুঁকি কাঁধে নিলে নিজের উন্নতি করা যায় না, সুমতি।' আশালতা হেসে বলল, 'সুমতিদি তো নেড়িকুত্তোদের জন্যেও রোজ দশ পয়সার বিস্কুট আনায়।' বিনিপিসি অবাক হয়ে সুমতির দিকে তাকাতেই সুমতির গালছুটো অস্বাভাবিক রকম গরম হয়ে উঠল। সুমতির নিজের কথা বিনিপিসির অজানা নয়। ছোট-খাটো বোর্ডিং এ যারা মানুষ হয়, তাদের অনেক সময় অনেকের সঙ্গে খামচাখামচি করে খেতে হয়। বলিষ্ঠদের আর বড়দের ভাগ্যেই জোটে। সুমতি চিরকাল নিজের ভাগটা নিজে আদায় করে খেয়েছে; চার বছর বয়সেও কেউ ওকে বলেনি—'আয় এটা খেয়ে নে, তা হলে আমি খুশি হব;' হঠাৎ গলাটা ব্যথা করে; সুমতির মন আজকাল দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

ওর চোখেমুখে এত কথার কতখানি ফুটে উঠেছিল বলা যায় না, কিন্তু আশালতা হেসে বলেছিল, 'না, সুমতিদি, আমরাও তোমার সঙ্গে আছি। আছি না, বিনিপিসিমা?' বিনিপিসি সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, 'তুমি ওকে স্বচ্ছন্দে সুমতি বলে ডাকতে পার আশালতা, ও তোমার সমবয়সী। আশালতা একটু লজ্জা পেয়ে

বলল, 'তুমি তো বেশ ; লোকে বয়স কমিয়ে ছোটদের সমবয়সী হবার চেষ্টা করে, আর তুমি তোমায় সমবয়সীদের চেয়ে ছোট করে রাখতে চাও। আচ্ছা, আমার বাবা একথা শুনলে কি বলবেন বল তো? দাঁড়াও তোমাকে ছোট করে দিচ্ছি।' এই বলে একটানে আশালতা সুমতির চুল খুলে দিল। হুড়মুড় করে যেন নদীর ঢল নামল। বিনিপিসি হঠাৎ উঠে পড়লেন; শুধু বললেন, 'ভিজে চুল পর্যন্ত সর্বদা কেন বেঁধে রাখ, সুমতি, তা তো বুঝি না। অথচ চুল খোলা এই প্রথম দেখলাম।'

আশালতা বললে—'তাতে আপনার নিজেরো খানিকটা দোষ আছে বিনিপিসি। এই তিন চার বছরে কখনো না-বলে ওর ঘরে ঢুকেছেন?' বিনিপিসি বললেন 'নিজের ঘরেও যদি মানুষ একা থাকতে না পারে, কোথায় একা থাকবে তা হলে?'

বিনিপিসি উঠে গেলে আশালতা বলেছিল, 'তাহলে দু তিনজনে বেশ একা একা থাকা যাবে. কি বল, সুমতি? আচ্ছা, কেউ তোমাকে কখনো সুমি বলে ডাকে নি? সুম্ বলে নি?'

সুমতি বললে, 'তুমি কি পাগল!'

আশালতা বললে—'মা মারা গেলে, অনেক দিন বাবা আর আমি একা একা থাকতাম, তারপর দাদুর কাছে চলে গেলাম। তোমার মা-বাবা নেই, না?

'না।' 'কবে মারা গেলেন? কিসে মারা গেলেন?'

'জানি না। যতদিন মনে পড়ে বোর্ডিংএই থেকেছি। কেউ খরচ দিত শুনেছি; কে জানি না। বিনিপিসিও হতে পারেন।'

'জিজ্ঞাসা কর নি?'

'না। সে সব উনি পছন্দ করেন না।'

'তুমি কর?'

'না।'

'কেন?'

'কি জানি।'

আর কথা হল না। বড় ডাক্তারবাবু এলেন। বরুণার জিনিসপত্র নিতে রিক্সা এল। বরুণা আগেই বেরিয়ে গেছিল। তবে রাতে এখানে খেয়ে যাবে জানিয়েছিল; মনুদির বাড়িতে আজ তার জন্য রান্না হয় নি। কাল পয়লা তারিখ, আসলে কাল থেকে বরুণা ও-বাড়ির বাসিন্দা।

রাতে এসেই বরুণা বলল,—'ও লোকটাকে দেখে ডাক্তারবাবু কি বললেন?' সুমতি উত্তর দিল, 'একটু ভালোর দিকেই যাচ্ছে বললেন। তবে এখনো কিছু বলা যায় না।' 'কৌশিক রায় ওর নার্সের আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে—বলেছে।' বিনিপিসি বললেন, মোটেই না, যা করার আমরাই করব। উষারাণীর চা পার্টিতে তো দেখলাম লোকটার প্রতি কৌশিকের পেয়ারের অন্ত নেই। হুঁঃ!'

আশালতা হঠাৎ বলল, 'বোধ হয় দুজনার চেনাজানা আছে।' বরুণা রেগে গেল। 'না, মোটেই না, চেনাজানা না হলে বুঝি কেউ কারো জন্য কিছু করে না? ঐ ট্রেনে আসতেই প্রথম দেখা।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আহত ব্যক্তি চিৎকার করে উঠল—'না কৌশিক না।' আ!—উঃ? সবাই ছুটে সেখানে গেল। কলেজের ছেলেটির বয়স কম, সে ঘাবড়ে গেছে। লোকটি ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করছে।

দারুণ জখম হলে কি হবে, লোকটির গায়ে দারুণ শক্তিও, তাকে ধরে রাখাই মুস্কিল। সতেরো বছরের মোহিতের অন্ততঃ কর্ম নয়। আশালতা খাটের পাশের মোড়ায় বসে পড়ে তাকে দু হাতে চেপে ধরে রাখল। আশালতার সুগোল বাহুতে মাংস পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠল। এ রকম মেয়ে দেখেনি সুমতি। ফ্লাস্ক থেকে বরফ বের করে রুগীর কপালে ঘষে দিতে লাগল সুমতি। নীলাভ চোখ দুটি খোলা, দরজার কাছে বরুণার সাদা মুখের ওপর নিবদ্ধ। যেন

কত কষ্টে লোকটির গলা থেকে শব্দটুকু বেরিয়ে এল, 'ব—রু—ণা!' অমনি চোখ বুজে আবার সে ঢলে পড়ল।

ছোট ডাক্তারবাবু বাড়ি গেছিলেন, রাতে এখানেই থাকবেন, মোহিত তাঁকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনল। তাঁর মুখ দেখেই এরা যেন দেহে প্রাণ পেল। রুগীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার হেসে বললেন, 'না, কোনো নতুন ভয়ের কারণ দেখছি না। আসলে এসবকে ভালো লক্ষণই বলতে হবে। গাছের গুঁড়ির মতো পড়ে ছিল, এখন একটু একটু করে জ্ঞান ফিরছে, লোক চিনছে, আবার কথা মনে পড়ছে। সোমেনদা বলছিলেন একজন ভদ্রমহিলার বাড়িতে পুলিসের হাঙ্গামা হয়, এটা তাঁর ইচ্ছা করে না, কিন্তু সম্ভবতঃ শেষ অবধি সেটা ঠেকানো যাবে না। এসব কেস্ রিপোর্ট করতে হয়।'

বরুণার গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকম কর্কশ শোনাল। 'কি সব কেস্, ডাক্তারবাবু? একটা লোকের আছাড় খেয়ে যদি মাথায় লাগে, তাও থানায় লাগাতে হবে?' হাওয়াটাকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যে আশালতা বললে 'একুশে আইন নাকি?' কেউ হাসল না। বরং বিনিপিসির গলাটাও কর্কশ হয়ে উঠল, 'তুমি তা হলে ওকে চেনো, বরুণা?'

বরুণা চেঁচিয়ে বলল, 'না, না, কক্ষনো না। যা সত্যি নয়, আপনারা কি আমাকে তাই বলতে চান?' তা হলে তোমার নাম জানলে কি করে?' 'হয়তো কৌশিকের কাছে শুনেছে। তাকে তো চেনে।' 'তা হলে অন্ততঃ কৌশিককে তুমি চেনো?'

বরুণা বলল, 'না, না, না, না।' বলেই কেঁদে ফেলল।

ছোট ডাক্তারবাবু বুদ্ধি করে প্রসঙ্গ পাল্টালেন। 'যান, খাওয়া দাওয়া সেরে নিন, রাত বাড়ছে, আগে বাঁচানো যাক, তারপর চেনা-চিনি।' দোর গোড়া থেকে হ্যাপা বললে 'আমার বারো জন শাশুড়িও তাই বলে। যখন তখন খায়, বাঙ্গালীদের কিছু ঠিক

নেই। কাজ করায় বেশি এঁটো বাসন মাজায়, মাইনে দেয় পঁচিশটে টাকা! নিজেদের খেতে কাজ করা ঢের ভালো।'

বিনিপিসি বললেন, 'বাজে বকিস নে। আশাদিদি তোকে দশ টাকা দেবে, সুমতিদির কাছ থেকে এটা ওটা রোজই নিচ্ছিস, তার ওপর ও বাড়ি গিয়ে ডাঃ সেনগুপ্তর মেজেনের কাছ থেকে কুড়ি টাকা নিয়ে হার গড়িয়েছিস্! তোকে আর কি বলব। হ্যাপা যেন আকাশ থেকে পড়ল।—'ওমা, কুড়ি টাকা দিয়ে হার গড়ালাম কুত্থেকে, মা? সেই তো মেলাতে আঠ্‌ঠারো টাকা দিয়ে হারছড়াটা কিনলাম, তাও জোড়া খুলে গেছে।' এই বলে হ্যাপা তখনকার মতো কথাটা মুলতুবি রেখে, খাবার পরিবেশন করতে গেল।

বরুণার নাকি খিদে নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছের বড়া দিয়ে একখানা হাতরুটি জড়িয়ে খেয়ে, এক গেলাস জল খেয়ে, সুমতির হাত ধরে টেনে তাকে চাতালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ও কেমন থাকে একটু খবর দিও, সুমতিদি। ঐ আশালতাটির জন্য যে আমাকে তোমরা এ-বাড়ি থেকে তাড়াবে এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বরুণা চলে গেল।

খেতে বসে বিনিপিসি বললেন, 'বুকের রক্ত জল করা টাকা দিয়ে এ বাড়ি যখন তৈরী করেছিলাম, স্বপ্নেও ভাবিনি যে একদিন এটা একটা পুরুষ মানুষদের আস্তানা হয়ে উঠবে! কি ভাবা যায় আর কিসে দাঁড়ায়!' তারপর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে মোহিত আর সুরঞ্জনকে বললেন, 'কিছু মনে কর না। যা সত্যি তাই বললাম। তোমরা এখনো ছোট আছ অন্য পুরুষদের মতো না হবার চেষ্টা করার সময় আছে।'

মোহিত একটু হাসল, সুরঞ্জন বড় ঠোঁটকাটা। সে বললে 'শুধু শুধু কেন চেষ্টা করব? খালি একটু সুজির পায়েস খাইয়ে লোভ না বাড়িয়ে, যদি দুটো মাছের বড়াও দেন তো আমি অন্ততঃ মেয়েমানুষদের মতো হতে চেষ্টা করব! শাড়ী পরব।'

হ্যাপা হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। আশালতা দুজনকে দুটি করে বড়া দিয়ে বলল—'পুরুষমানুষরা বড্ড খায়। পুরুষমানুষ পুষতে হলে আমরা ফতুর হয়ে যাব যে রে! আমার বাবাও বড্ড খান।'

বাতাস হাল্কা করার বৃথা চেষ্টা। ছেলেরা উঠে গেলে বিনিপিসি বললেন, 'এর শেষ কোথায় দাঁড়াবে ভেবে পাচ্ছি নে। ও লোকটা যদি না-ই বাঁচে—,'সুমতি মুখ তুলে ব্যগ্রভাবে বলল, 'কেন বাঁচবে না? ডাক্তারবাবু বলেছেন বাঁচার আশা আছে।'

আশালতা বললে, 'আশা সব সময় ফলে না, সুমতি।'

বিনিপিসির মনে শান্তি নেই। বারবার বলতে লাগলেন, 'বরুণা ওকে নিশ্চয় চেনে। এর মধ্যে একটা গোলমেলে কিছু আছে নিশ্চয়। চিরকাল বলে এসেছি এই জায়গাটা গভীর পুকুরের মতো, এর জলে কখনো ঢেউ ওঠে না, অথচ এখন দেখ! আশালতা বললে—'গভীর পুকুরের জলের তলায় নাড়া দিলে অনেক বীভৎস জিনিসও ভেসে উঠতে পারে, বিনিপিসি। তাছাড়া এক্ষেত্রে এ জায়গাকে দোষ দেবেন না; যা এসেছে, বাইরে থেকেই এসেছে।'

সুমতিও ঘরে গিয়ে বসলে ছোট ডাক্তারবাবু বাইরে এসে লেডিসের অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন 'লোকটি কোথায় উঠেছিল, কার কাছে এসেছিল জানতে পারলেই রহস্য ঘুচে যায়।' 'পকেটে সে রকম কিছু পেলাম না। একটা কাগজ না, একটা চিঠি না। শুধু একটা মানিব্যাগ, তাতে নোটেতে রেজকিতে টাকা দশেক, একটা রুমাল তার কোনায় লেখা এ—এম্। কিন্তু প্যাণ্টের পকেটের সঙ্গে সেলাই করা একটি বড় খামে পাঁচটা হাজার টাকার নতুন নোট! আন্‌কোরা নতুন; তবে আসল না মেকি তা কে জানে। শুধু শুধু আর কেউ ওর মাথায় ডাণ্ডা মারে নি। 'যাই হোক কপর্দক শূন্য নয়, এবার মনে হচ্ছে চিকিৎসার জন্য ভাবতে হবে না। বিনিপিসির হাত পা ঠাণ্ডা, 'ম্-

মাথায় ডাণ্ডা! কি বলছেন ডাক্তারবাবু? এখানে কতকগুলো অল্পবয়সী মেয়ে নিয়ে একা থাকি কি করে তাই বলুন?'

ছোট ডাক্তার হেসে ফেললেন—'নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনাদের তো আর হাজার টাকার পাঁচটা নোট নেই যে তার লোভে কেউ মাথায় ডাণ্ডা মারবে!'

আশালতা আস্তে আস্তে বলল, 'তার লোভেই যদি হবে তো নিল না কেন?'

'কি জানি, হয়তো খুঁজেই পাই নি, কিম্বা হয়তো সুমতিদি আর সেনগুপ্ত সাহেব এসে পড়াতে, পারে নি। কিম্বা হয়তো সত্যিই বে-মক্কা পড়ে গিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে জখম হয়েছে।' কথাটা তখনকার মতো থেমে গেলেও; ঐখানে তার শেষ হল না। এখানকার খবর প্রচারের কেন্দ্র হল মহিলা সমবায়, সেখানে ওস্তাদ হাতের দ্রুত কারিগরির সঙ্গে সঙ্গে গুজব যেমন জমে, তেমন আর কোথাও নয়। পরদিন সহরের কারো শুনতে বাকি রইল না যে, বিনিপিসির অনাহূত অতিথি দুর্দান্ত নোট জালিয়াৎ, ভাগাভাগি নিয়ে দলের লোকের সঙ্গে মারপিট করে পথে পড়েছিল, আপদ গেছিল। সুমতির সবটাতে বাড়াবাড়ি, তাকে আবার ঘরে টেনে এনে বিনিপিসির সুদ্ধ হাতে হাত-কড়া লাগাবে। দু-জনার কারোই চাকরি থাকবে না, এইবেলা হেমলতাদির দুই ভগ্নীকে আনতে পারলে হেমলতা ঠাকরুণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

ডালপালা ছড়িয়ে কথাটা কোথায় যে না পৌঁছল তার ঠিক নেই; সেই সূত্রে সেক্রেটারি মশাই এই প্রথম বিনিপিসির বাড়ীতে পা দিলেন। বিনিপিসিও এক হাত নিলেন, অর্থাৎ তর্ক করলেন না, পর্দানসীন সেজে গা ঢাকা দিলেন। হ্যাপা গিয়ে ডাঃ সেনগুপ্তকে ডেকে আনল, ছোট ডাক্তারও ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই কথা বলে, নিশ্চিন্ত হয়ে সেক্রেটারি বাড়ি গেলেন। মেয়েদের যেমন কথা! তিলকে তাল করতে ছাড়ে না। সেক্রেটারির আধাবয়সী গিন্নিটি

তো এ বিষয়ে ওস্তাদ। অবিশ্যি এক দিক দিয়ে ভালো, কারণ মহিলা সমবায় মারফৎ সব কথাই অচিরাৎ সেক্রেটারির কানে ওঠে। কাজেই গিন্নির দুর্বলতায় তিনি প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকেন।

এ কথাগুলো সেদিন বিকেলে মন্নু এসে বিনিপিসির চায়ের টেবিলে পেশ করল। চা খেতে খেতে একবার উঠে মন্নু নবাগতা পাশ করা নার্সটিকেও দেখে এল। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, কালো, মোটা, মাথায় চুল কম, নাকের ডগায় চশমা, হাতে ক্রুশ ও লেস্‌বোনা। সুমতি বলল নাকি দক্ষ সেবিকা এক হাতে সব করে নেয়, হাসিখুসি ঠাণ্ডা মানুষ। এ ঘরে ফিরে এসে মন্নু একবার আশালতার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'তোমাদের বরুণাটি কিন্তু বেশ!' 'কেন? কি করে সে?'

'কি আবার করবে? সারাক্ষণ গাবগাছের নিচে বসে পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে কিসের অত কথা বুঝি না।'

বিনিপিসি ফিক করে হেসে ফেললেন। মন্নু গম্ভীর মুখে বলল 'না, বিনিপিসি, রসের ব্যাপার নয়, তা হলে তো বুঝলাম। ছোকরা তো একটা কার্তিক বিশেষ। তার উপর নাকি অবস্থা ভালো। 'কোথায় শুনলে এত কথা?'

'না শুনেই বা করি কি? পাশের বাড়িতে উষারাণী ও সাঙ্গোপাঙ্গ সহ গুরুদেব থাকলে তোমরাও কত কথা শুনতে তার ঠিক নেই। সাধুসজ্জনরা বিষয়-আশয়ের অসারতার কথা জানেন বলেই বোধহয় তাই নিয়ে এত আলোচনা হয়।'

'কি বিষয় আশয়ের আলোচনা?'

'কি জানি ঠিক মালুম দিল না। তবে মনে হল কৌশিক রায় এখানে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে এসেছে, গুরুরও সেবা করবে আবার কলাও বেচবে।'

'তাই বলে বরুণার সঙ্গে কি? বরুণা বয়সের অনুপাতে খানিকটা খুকিমি করে বটে, অত কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায়

কান্না, এই রাগ, এই লক্ষ্মী, কিন্তু সেটা অনেকখানি মানুষটা সরল ও সাদা বলেই তো।' মনু বলল, 'কে সরল ও সাদা?' বলে কাষ্ঠ হাসি হাসল।

কথার মাঝখানে আশালতা উঠে গেছিল। বলেছিল বাবাকে চিঠি লেখা হয়েছে সকালে, অথচ এখন পর্যান্ত ডাকে দেওয়া হয় নি।

সে চলে গেলে মনু বলল—'ওর নাম যদি আশালতা চৌধুরী হয়তো ওর বাবার নাম কি করে ডাক্তার বিমান রায় হয়, এটা আমাকে বুঝিয়ে বল, সুমতি। ওকি বিনিপিসি, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?' বিনিপিসির বোধ হয় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কেমন যেন টেনে টেনে বললেন—'কি করে জানলে ওর বাবার নাম বিমান রায়?'

'বাঃ, এ ঘরে আসার আগে ওর পড়ার টেবিলের গন্ধ শুঁকে এলাম যে! জানেনই, তো আমার সব কিছুতে নাক গলানো অভ্যেস।' বিনিপিসির হাত থেকে হঠাৎ চায়ের পেয়ালাটা খসে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙ্গে গেল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জানলা দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যার দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে বললেন, 'সন্ধ্যা বেলায় পাখিরা সব ঘরে ফিরে আসে।'

সুমতি কখন উঠে পাশে দাঁড়িয়েছে। 'একটু জল দিই, পিসিমা।' বিনিপিসির সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে উঠল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে বললেন, 'নাঃ, ওটা কিছু নয়, সাময়িক দুর্বলতা।'

মনু চটে গেল। 'সাময়িক দুর্বলতা আবার কি বিনিপিসি? হয় শরীর খারাপ, নয় সক্ পেলেন। কি ব্যাপার বলুন তো?'

বিনিপিসিকে অম্লান বদনে ঘুগ্‌নি খেতে দেখে ততোধিক আশ্চর্য হয়ে মনু সুমতিকে বলল, 'এ যে দেখি চারদিকে রহস্যের জাল; পাশের ঘরে বড় রহস্য, তাছাড়া বরুণা এক রহস্য, কৌশিক রায় আরেক রহস্য, আর বিনিপিসি—যাকে আমি পনেরো বছর ধরে

এখানেই দেখছি, তিনিও যদি এখন রহস্য ফাঁদেন, তুমিই বা বাদ যাও কেন, সুমতিদি ?'

সুমতি শুধু একটু হাসল। মনু বলে যেতে লাগল, 'উষারাণীর বাড়াবাড়ি যদি দেখ! অত পয়সা কোথায় পায় সেও আরেক রহস্য! গুরুদেবের সঙ্গে যারা এসেছে; তাদের কান মুচড়ে আদায় করছে বোধহয়, গুরুদেবের কাছ থেকে তো কিছু নেয় না জানি। আমি বারান্দা থেকে মজা দেখি, কে আসে, কে যায়, কি আনে। বেড়ে মজা যাই বল। ছোকরা গুরুদেব পা মেলে দিয়ে বসে থাকেন, বুড়িরা এসে মাথা খোঁড়েন আর হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙেন। দান সামগ্রীর পাহাড় জমে।'

বিনিপিসি কাষ্ঠ হাসলেন, তোমাদের এখানে আবার কোনো হাঁড়ি ভাঙতে বাকি আছে নাকি? কার বাড়ি কি রান্না হয়, কার কত মাইনে, তার কতটা খরচ হয়, কতটা জমে, কার সঙ্গে কার ভাব, কার ঝগড়া, কিছুই তো এখানে কারো অজানা থাকে না।'

মনু উঠে দাঁড়াল, 'আমার বিষয়ই বলছেন বোধ হয়, বিনিপিসি? বরুণা কেন এ বাড়ি ছেড়েছে এতক্ষণে বুঝতে পারছি।' সুমতি বাধা দিল, 'কি যে বল মনু, পিসিমাতো কিছু অন্যায় কথা বলেন নি। আর তোমার বিষয়ই বা বলতে যাবেন কেন?'

'কেন, আমি কি এতই ফেলনা যে আমার বিষয় কেউ কিছু বলতেও পারে না? তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সুমতিদি, ক'দিনেই। আমার এখন ওঠা উচিত। কিন্তু যদি কিছু মনে না কর তো রুগীর অবস্থাটা কেমন জানতে পারি? বরুণা জিজ্ঞাসা করতে বলেছে তাই বলছি, নইলে আমার আর কি তোমরা তাকে আগলে রেখেছ, কাউকে কাছে ঘেঁসতে দাওনা শুনেছি, কেন দাওনা তার কারণও শুনেছি, পকেটে হাজার হাজার টাকা—'

কেমন যেন মনুর মনে একটা কলের রবার কেটে যাবার মতো হল। অনর্গল কথা বেরিয়ে আসতে লাগল।

'বেশি টাকা এক সঙ্গে দেখলে মাথায় ঠিক থাকে না। টাকার জন্যে—'

বিনিপিসি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন,—'তুমি যাও এখান থেকে মনু যে বিষয় বোঝ না, সে বিষয় যা মুখে আসে তাই বল না। পাঁচ হাজার টাকা আবার টাকা নাকি? আমার বাবার কত লক্ষ টাকা ছিল তার ঠিক নেই।'

মনু উঠে পড়ে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বলল—'বাপের লক্ষ টাকা থাকতে পারে, কিন্তু নিজে তো পয়সা টিপে টিপে বের করেন, বাড়িতে অতিথি এলে শুকিয়ে মারেন, এ আমার শুধু বরুণার কাছে শোনা নয়, সুমতিদিও কতবার বলেছে।'

বিনিপিসি ছাইয়ের মতো মুখ করে সুমতির দিকে চেয়ে রইলেন। সুমতি মাথা নেড়ে বলল, 'না, পিসিমা না, না।'

মনু ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, সুমতির যা কল্পনার বাইরে ছিল তাও ঘটল। বিনিপিসির দুই চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল বেরিয়ে গাল বেয়ে টস্ টস্ করে কোলে পড়তে লাগল। সুমতি সইতে না পেরে উঠে গিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, 'না, পিসিমা, আমি ওকথা বলি নি।'

প্রতি মুহূর্তে ভয়—বিনিপিসি এবার ঠেলে হাত সরিয়ে রাগতমুখে উঠে দাঁড়াবেন। তাই হলেই যেন ভালো ছিল, বিনিপিসি কিন্তু একদৃষ্টে সুমতির মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'জানি, মনু কি আজ তোমাকে চেনাবে, আমি সব জানি, সুমতি; কিছুই জানতে বাকি নেই—' যেমনি সুমতিও চোখের জল মুছিয়ে দেয়, অমনি আবার বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। নার্স এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই বিনিপিসি মুখখানি ঘুরিয়ে উঠে গেলেন।

বড় ডাক্তারবাবু নিজের ধোয়া জামাপাজামা পরিয়ে দিয়েছেন। ছোট ডাক্তারেতে নার্সেতে মিলে রুগীর গা মুছিয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে

দিয়েছেন। বিকেল থেকে তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে। মুখখানি বড় ক্লিষ্ট। সুমতি রাতে কাছে গিয়ে বসতেই এই প্রথম স্পষ্ট কথা বলল সে।

'আপনাদের বড় কষ্ট দিচ্ছি।'

সুমতি বললে, 'ওকথা ভাববেন না; তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন এটুকু সকলের জন্য সকলে করে।' সে বললে—'না, তা কখনো করে না।' তারপর পরনে পাজামার পকেট চাপড়ে কি যেন একবার খুঁজল, ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। ব্যাথা লাগাতে বলল, 'উঃ!'

সুমতি বলল, 'মাথায় চোট লেগেছে, যত কম নাড়েন তত ভালো। কথাও বেশি না বলাই ভালো। বোধহয় আপনার পকেটের জিনিস খুঁজছেন? সে সব নিরাপদে ডাক্তারবাবুর কাছে তোলা আছে।'

লোকটি সুমতির মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চোখের পাতা নেমে এল। এ ঘুমটাকে অনেক স্বাভাবিক মনে হল। তবু ঘুমের ঘোরে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজতে লাগল; সুমতি বলিষ্ঠ মুঠিতে হাতখানি ধরতেই, স্থির হয়ে ঘুমোতে লাগল।

চেয়ে চেয়ে দেখল সুমতি। বিনিপিসি পুরুষমানুষ পছন্দ করেন না। বোর্ডিংএর মিস্‌ বিশ্বাসও তাদের ওপর হাড়ে চটা ছিলেন, অল্প বয়স থেকে সুমতিকে কেবলি তাদের সম্বন্ধে সাবধান করে এসেছেন। বলেছেন, আমার বিয়ে না হয়ে থাকতে পারে, আমার মা'র তো হয়েছিল; এ আমার মার কাছ থেকে শোনা যে—হেন কাজ নেই যা ওরা করতে না পারে। যদি তোমার কোনো বুদ্ধি থাকে তো, পুরুষ মানুষদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না। যে-ই দিয়েছে, তাকেই পস্তাতে হয়েছে! এত বার শুনেছে সুমতি এসব কথা যে মুখস্থ হয়ে গেছে।

কে না জানে পুরুষরা মেয়েদের জাতশত্রু, প্রথম প্রথম কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগত। কেন, তারা করে কি? মিস্ বিশ্বাস চোখ পাকিয়ে বলতেন, 'কি করে না? সর্বস্ব অপহরণ করে। তারপর লেবুর ছিবড়ার মতো ফেলে দেয় আবার একটা বিয়ে করে।' তাই শুনে সুমতি তো অবাক্। মিসেস্ তলাপত্রও এসে যোগ দিতেন।

পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে পৃথিবীর তিন ভাগ দুঃখ ঘুচে যেত। মেয়েরা তা বুঝবে না। আমাকে দেখে শেখো। সুমতি, তলাপত্রকে গোর দেবার আগে পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যেও সুখ ভোগ করি নি।' তারপর শিউরে উঠে বলতেন, 'যেমন আমার বাবা ছিলেন, তেমনি ভাই দুটোও হয়েছে। অকাল কুষ্মাণ্ড একেকটা, বোরা রোজগার করে খাওয়ায়। কেউ দেখে শেখে, আবার কেউ ঠেকে শেখে, আবার কেউ ঠেকেও শেখে না, সুমতি।' লোকটিকে কিন্তু সুমতির ভালো লাগছিল। কেমন যেন মায়া পড়ে যাচ্ছিল। খোঁচা দাড়ি কতদিন কামানো হয়নি। শুকনো ঠোঁট, ডাক্তারবাবুর জামা-পাজামা খানিকটা খাটো হয়েছে, হাতের কব্জির ওপর চার ইঞ্চি জায়গা খালি। কেমন একটা অসহায় ভাব। চীনদেশে নাকি একটা পুরানো প্রবাদ আছে যে, কাউকে যদি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায়, তা হলে বাকি জীবনটা তার জন্যে দায়ী থাকতে হয়। তা হলে এ মানুষটিতে সুমতির আর ডাক্তার সেনগুপ্তর আধা আধি বখরা।

ক্রমে সে ভালো হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তারবাবুর মতে এত মজবুৎ শরীর না হলে এত তাড়াতাড়ি সারতে পারত না। বাংলা দেশের ছেলে বলে মনেই হয় না। লম্বা চওড়া, গায়ে এতটুকু অতিরিক্ত মাংস নেই, ইঁটের মতো শক্ত হাত-পা, শামলা রঙে কেমন একটা লালচে ভাব, যেন খোলা হাওয়ায় অনেকদিন থেকেছে। পরদিন ছোট ডাক্তারে আর নার্সেতে মিলে ওর দাড়ি কামিয়ে দিলেন। ছোট ছেলের মতো মোলায়েম গাল। নিজে থেকে

যেটুকু বলে তার বেশি প্রশ্ন করতে ডাক্তারবাবু মানা করেছেন। দর্শকদের এ ঘরে ঢোকা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। মুস্কিল হল যে নিজে থেকে কোনো কিছুই বলে না সে।

একটু চিন্তিত মুখে বিনিপিসি আর সুমতিকে আলাদা ডেকে নিয়ে বড় ডাক্তার বলেছিলেন, 'এখানকার ব্যাপার জানেন তো। এত সাবধানে চলাফেরা করলাম, তবু কথাটা গিয়ে চক্রবর্তীর কানে পৌঁছেছে।' বিনিপিসি বললেন, 'কে চক্রবর্তী?' 'অতুল চক্রবর্তী, এখানকার পুলিশের কর্তা, বিনিপিসি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ; ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিলেন, 'কোনো ভাবনা নেই। অতুল আমার শালার বন্ধু, তাকে বলেছি এ একটা সাদাসিধে অ্যাক্সিডেন্ট কেস্। তবু আসবে হয়তো একদিন একটু রুটিন এন্‌কোয়ারি করতে। হাজার টাকার পাঁচটে নোটের কথা ও শুনেছে তো। কে নাকি থানায় উড়ো চিঠি আর বলেন কেন! তবে পেসেন্ট আরেকটু না সারলে তো আর আসতে দেব না।'

তারপর সুমতির আর বিনিপিসির উদ্বিগ্ন মুখ দেখে আরো বললেন, 'অমনি মুখ শুকিয়ে গেল? কেন, আপনারা কি কোনো অন্যায় কাজ করেছেন নাকি? টাকা তো আমার কাছে। ওর কাছেই দিয়ে দেব। পুলিসকে যা বলার ও নিজেই বলবে। আমি ওর পাশে থাকব, হাজার হোক আমার পেসেন্ট তো।'

সেদিনও বরুণা এসেছিল, মনুকে সঙ্গে নিয়ে। থানার উড়োচিঠির কথা বাইরে থেকে শুনে এসেছিল। বরুণা ভারি উত্তেজিত ; একটা মরণাপন্ন রুগী, হতে পারে ভালোর দিকে যাচ্ছে এখন, পুলিসে এসে জেরা করলেই ওর অবস্থাটা কেমন হবে জানা আছে। কখনো অ্যালাও করা উচিত নয়। বেচারা এখন প্রকৃতিস্থই নয়, এলোমেলো যার তার নাম ধরে ডাকছে—'

মনু বলে বসল, 'এলোমেলো ঠিক নয়। তোমার নাম বলেছে আর কৌশিকের নাম বলেছে। একটা যোগসূত্র কিছু নিশ্চয়

বেরুবে! মিছিমিছি তো আর এখানে আসে নি সে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গে আর কৌশিকের সঙ্গেই তার কাজ আছে।'

শুনে বরুণা আবার মূর্ছা যায় আর কি! 'ওরকম কথা কেন বলছেন মনুদি? আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আজ যদি আমার কি ভাই বেঁচে থাকত, এরকম বলতে সাহস পেত না কেউ। নিতান্ত অসহায়া বলেই—' বরুণা এখানে থেকে বড় একটা ঢোক গিলল। কৌশিক রায় চাতালে উঠে এল।

'কিছু মনে করবেন না, বিনিপিসি, আমার একবার আসা দরকার মনে হল বলেই এলাম। আমি ছাড়া কেউ ওকে আগে দেখে নি। এখন শুনছি এর মধ্যে পুলিস নাকি নাক গলাবে, আপনি কিন্তু সেটা হতে দেবেন না। বাড়ীতে রুগী, এর মধ্যে পুলিস ঢুকতে দেবেন না কখনো। আপনার কতকগুলো রাইট্ আছে।'

মনু সর্বদাই বেশি কথা বলে। 'আপনারি বা এত মাথাব্যাথা কিসের বলুন তো? বিনিপিসির বাড়িতে পুলিস এলে আপনার কি? আমি তো দেখছি বাইরের পাঁচজন মিলে ব্যাপারটাকে বেশ ঘোরালো করে তুলছে। আসুক না পুলিস। ভালো মানুষের আবার পুলিসের কি ভয়? তাই না বিনিপিসি।'

বিনিপিসি কিন্তু উল্টা কথা বললেন, 'আমি ভাবছি ক'দিনের ছুটি নিয়ে, এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হব। মাথাটা রোজ কেমন করে, চেক্ করানো দরকার। বাড়িতে তো লোকের ভিড়ের চোটে শান্তি পাবার জো নেই।'

মনুর মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'এখানে ভিড় না-ই বাড়াতেন, কৌশিকবাবু।' কৌশিক হেসে বললে, 'আপনারা দুজনেও তো বাড়াচ্ছেন।' মনু উঠে দাঁড়াল, 'আমার কথা আলাদা, আমি ওঁদের পুরানো বন্ধু।' কৌশিক বললে, 'আমার কথাও আলাদা, আমি ঊষারাণী পিসির ভাইপো; সেই সম্পর্কে আমিও পর নই।'

সুমতি হেসে ফেলল। অমনি সবাই তার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'তোমার কি লঘুগুরু জ্ঞান নেই? আজকাল সব কিছুতেই তোমার হাসি পায়।'

সুমতি লজ্জা পেল, 'না, পিসিমা, ওদের ঝগড়া শুনে না হেসে করি কি?'

মনু গম্ভীর মুখ করে বলল 'কৌশিকবাবুকে তো আর আমি চিনি না, যে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করব? বরুণার কথা আলাদা; গাবতলায় রোজ ওদের ঝগড়া হয়।'

বরুণা অমনি বাড়ির দিকে রওনা দিল। কৌশিক বলল, 'এটাকে বিলো দি বেল্ট বলে, এটা বে-আইনী। আমি একজন উকীল, আমার পরামর্শ মতো চলুন মনুদি। কখনো রেগে যাবেন না; দেখছেন না আমি কিছুতেই রাগি না। ভিড় বাড়াচ্ছি বললেও রাগছি না। আসলে একটা কাজের কথা নিয়েই এসেছিলাম, বিনিপিসি। আমার মনে হয় আপনাদের পেসেন্টকে যখন পুলিস থেকে জেরা করবে, তখন তাঁর পক্ষটা রক্ষা করবার জন্য আমি থাকলে ভালো। এর জন্যে পয়সা কড়ি লাগবে না। অচেনা হলেও, আমি নিজেকে ওঁর বন্ধু মনে করি। গুরুদেবেরো সেই মত। আজ যাবার আগে আমাকে তাই বলে গেছেন। তাই থেকে গেলাম।

আশালতা কখন বাড়ি ফিরেছে কেউ লক্ষ্য করে নি। চাতালে বাইরের লোক থাকলে এরা সকলেই অনেক সময় রান্নাঘর দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। কৌশিক চোখ তুলে তাকে দেখতে পেয়েই উঠে পড়ল। 'আচ্ছা, আসি বিনিপিসি; আরো ভিড় বাড়ছে দেখছেনতো?'

চলেই যাচ্ছিল কৌশিক, এমন সময় নার্স এসে বলল, 'কে এসেছেন, অরবিন্দবাবু তাকে ডাকছেন।' সবাই চমকে উঠল। 'অরবিন্দবাবু?' 'কেন, নিজের নাম তো তাই বললেন, অরবিন্দ মুখার্জি। আপনারা কি জানতেন না? চার্ট লিখবার জন্য আমি জিগগেস করতে তাই তো বললেন!'

কৌশিক বলল, 'একবার দেখেই আসি ডাকছে যখন।' নার্সও সঙ্গে আসছিল, কৌশিক ফিরে বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, রুগীর ঘরে ভিড় করতে হয় না।'

সবাই একটু আশ্চর্য হয়ে গেল রুগীর ঘরে কৌশিক তিন মিনিট্ও ছিল কি না সন্দেহ। বেরিয়ে এসে বলল, 'সেদিনের পর অনেক ইমপ্রুভমেণ্ট দেখছি, কিন্তু মাথাটা খুব পরিষ্কার হয় নি। আমাকে অন্য কেউ ভেবেছিল। মুখ দেখে আর কিছু বলল না। চলুন মনুদি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাই।

সবাই বিদায় নিলে পর বিনিপিসি আর আশালতা অনেকক্ষণ চাতালে বসে গল্প করলেন। বিনিপিসি বললেন, 'এটা একটা ছবির ধাঁধার মতো। ছোটবেলায় ছবির ধাঁধা নিয়ে খেলনি, আশালতা?' আশালতা বললে, 'জিগ্‌স পাজ্‌ল্-এর কথা বলছেন বিনিপিসি? খেলেছি বই কি। আকাবাকা টুকরো কাঠ জুড়ে জুড়ে গোটা একটা ছবি করতে হয়। কিন্তু ঠিক করে বসাতে না পারলে কিছুই না।' বিনিপিসি বললেন, 'এও একটা জিগ্‌-স' পাজ্‌ল্; তবে মাঝখান থেকে কয়েকটা টুকরো বাদ পড়েছে, সেগুলো পেলেই ঠিক ঠিক সব মিলে যাবে।'

আশালতা চুপ করে রইল। তার বুকটা একটু ঢিপ্‌ঢিপ করছিল।

সত্যিই তার নাম অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। গভীর রাতে সুমতির চোখের দিকে চেয়ে সে বারবার বললে—'আমার নাম অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী। সিমলার কাছে আমাদের অনেক বনজঙ্গলে ভরা জমি-জমা আছে, টাকাকড়ি নেই।' বলেই সুমতির দিকে এমন করে তাকাল, যেন এর পরের কথাগুলি সুমতির জানা উচিত।

সুমতি বললে 'বাড়িতে আর কে আছেন?'

'শুধু আমি আর মা। বাবা কবে মারা গেছেন। আমি তখন

ছোট। মা কত কষ্টে সম্পত্তি আগলেছেন, আমাকে মানুষ করেছেন।'

সুমতি বললে, 'অত কথা বলবেন না ; রাতে ঘুমোতে হয়।'

অরবিন্দ ব্যাকুল হয়ে বলল, 'না, না, ঘুমোতে হয় না, এসব কথা আপনাকে বলা দরকার। সুমতি ওর কপালে ও-ডি কলোনে ভেজা রুমাল আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিল। ভিজে গেলে ওর চুলগুলো কুঁকড়ে যায়।

'ঘুম পাচ্ছে না?' 'এত কথা কি করে জমা করে রাখি? বললে আরাম হবে? 'তবে বলুন।'

অরবিন্দ চুপ করে রইল। সুমতি তাকে উৎসাহ দেবার জন্য বলল, 'কোথায় উঠেছিলেন, এখানে এসে? আপনার স্যুটকেস কোথায়?' সে অসহায় ভাবে সুমতির দিকে চাইল, 'কেন, এখানে নেই?' সুমতি হাসল। 'এখানে কি করে থাকবে? আপনাকে যে পথ থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে। মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গাছতলায় পড়েছিলেন। তার আগের কথা মনে পড়ছে না?'

অরবিন্দ বললে, 'পড়ছে। স্টেশনের রেস্টরুমে স্যুটকেস আছে। একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

সুমতি বললে, 'কৌশিকের সঙ্গে, না? তারপর, কি হল?' অবাক হয়ে দেখে সুমতি অরবিন্দর সমস্ত মুখখানি গাঢ় লাল রঙে ছেয়ে গেছে। নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে ধরে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে চুপ করে পড়ে রইল সে। সমস্ত মুখে কি এক ক্লান্তি, কি এক বিষাদ দেখল সুমতি, সে সুমতিই জানে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে গভীর করুণার সঙ্গে বলল, 'না, না, আমি কিছু জানতে চাই না। আপনি ভালো থাকুন, শুধু তাই চাই।'

চোখ ঢেকেই অরবিন্দ বললে, 'শুনলে আমাকে ঘৃণা করবেন।'

সুমতি একটু হাসল।

সকাল বেলায় বড় ডাক্তারবাবুকে খানিকটা খানিকটা বলতে

হল। রুগী নিজে বিশেষ কথা বলল না। সুমতির মনে হল সে ক্লান্তির ভান করছে; পাছে ডাক্তারবাবু কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাই চোখ বুজে শুয়ে থাকছে। বোধ হয় কাউকে জড়াতে চায় না। যাই করুক, সুমতির দৃঢ় বিশ্বাস সে অন্যায় কিছু করছে না। তবে আগে হয় তো একটা অন্যায় কিছু করে ফেলেছে, যার জন্য এখন নিদারুণ অনুতাপ হচ্ছে। সুমতি আজকাল অন্ততঃ এই মানুষটির সম্পর্কে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে। যদি সাহস করে অরবিন্দ বলে ওকে মনের কথা, তাহলে সুমতি চেষ্টা করে দেখতে পারে, কি প্রতিকার করা যায়। সকলেরি এমন একটি মানুষ থাকা দরকার —যে সব বোঝে, সব ক্ষমা করে। ছোটবেলায় বোর্ডিং-এ নিমকু ঝি যেমন ছিল। নিমকু না থাকলে সুমতি কি করে বাঁচত? তারপর একদিন মিস বিশ্বাসের হার চুরি করার জন্য নিমকুকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল আর এ মুখো হলে পুলিসে দেবে। সুমতি আর কখনো নিমকুকে দেখে নি। এত দিনে সে নিশ্চয় মরে টরে গেছে। পেলে তাকে রাখত সুমতি। যে সব বোঝে, সে সব ক্ষমা করে।

মিস বিশ্বাসের জন্য আলাদা রান্না হত। মাঝে মাঝে মাংস হত, মাছের চপ হত। সুমতি কখনো ওসব খায় নি, বড় ইচ্ছা করত একবার চেখে দেখে। একদিন রান্নাঘরের দরজার আড়ালে নিমকু ওকে ডেকে নিয়ে চপ খাইয়েছিল। মাটির খুরি করে কত দিন মাংস খাইয়েছিল।

যাবার আগে ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, সেদিন বিকেলের দিকে এমনি সাদা কাপড় পরে অতুল চক্রবর্তী একবার আসবেন। আন্-অফিসিয়েলি দু একটা প্রশ্ন করবেন। আসলে এ ব্যাপারে পুলিসের কোনো ইন্টারেষ্ট নেই; সাদা সিধে অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার। পকেটে অত টাকা রাখা অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে কিছুই নয়, জমিজমা কেনার ইচ্ছাতেই সম্ভবতঃ এসেছিল। আজকাল লোকে

কাঁচা টাকা রাখতে ভয় পায়। অতুলবাবু একটু কৌতূহল মেটাবেন আর কি। সুমতি শুনে ভয়েই মরে! দুপুরে নার্স খেতে গেলে অরবিন্দকে সাবধান করে দিতে বসল সুমতি। টাকার কথা তুলতেই সে একটু হেসে বলল, 'ওর জন্য কোনো ভাবনা নেই, আমার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি, ওর মধ্যে কোনো গোলমাল নেই।' তারপর সুমতির উদ্বিগ্ন মুখ দেখে, ওর হাতখানি ধরে বলল—'আসুক না পুলিস, আমার কোনো ভয় নাই। আপনারি বা কিসের অত ভয়?'

সুমতির চোখে জল, মুখে হাসি। অরবিন্দ বললে, 'তুমি—আপনি—'বলে থেমে গিয়ে চোখ বন্ধ করল। এরি মধ্যে নার্স ফিরে এল, সুমতিও উঠে গেল। বিকেলে শুধু ডাক্তারবাবু আর অতুল চক্রবর্তী এলেন না, কৌশিকও এল। আগেই এল। সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে, প্রায় আধ ঘণ্টা অরবিন্দর সঙ্গে কি নিয়ে পরামর্শ করল। সবাই বললে উকীল বটে! আশালতা বললে, 'স্বনির্বাচিত অনাহারী উকীল!

বলা বাহুল্য বরুণা বাদ যায় নি। সকালেই ডাক্তারবাবু অরবিন্দের লেখা চিঠি নিয়ে রেস্টরুম থেকে অরবিন্দের সুটকেস নিয়ে এসেছিলেন। অনেক দিন পরে অরবিন্দ নিজের কাপড় চোপড় পরে আরাম পেল। মাথার ব্যাণ্ডেজও ডাক্তারবাবু খুলে দিলেন। আঘাত গুরুতর হলেও বাইরে তার পরিচয় কম। এক জায়গায় চামড়া ফেটে বেশ রক্তপাত হয়েছিল। দুটো সেলাই দিতে হয়েছিল, এখন সে সব শুকিয়ে গেছে।

মস্তিষ্কের যে বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয়নি তাও বোঝা যাচ্ছে। তবে দুর্বল। কথাও কম বলে, কিন্তু সে সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই। ডাক্তারবাবু সুমতিকে বলেছিলেন, 'ওর বিবেকের ওপর দশ মণ বোঝা চেপে রয়েছে, তার একটা ফয়সলা না হওয়া অবধি, একেবারে স্বাভাবিক ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না।'

ডাক্তারের কাঁধে ভর দিয়ে চাতালে এসেছে অরবিন্দ। এখনো মাথা তুলতেই মাথা ঝিমঝিম করে, তাই বিনিপিসির বড় ইজিচেয়ারে কুশনে ঠেস দিয়ে বসেছে; পাশেই কৌশিক, কানে মন্ত্রণা দেবার জন্য।

পাশের ঘরে বরুণা, আশালতা, বিনিপিসি, খালি সুমতিকে ছাড়ে নি অরবিন্দ, সে তার অন্য পাশে চুপ করে বসে আছে। মুখখানি ঈষৎ বিষণ্ণ, অরবিন্দের যে এবার সময় হয়েছে সে বিষয় তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। বড় ভাবনা সুমতির, অতুল বাবুর কথার ঠিক ঠিক উত্তর দিতে অরবিন্দ হয়তো পারবে না। কৌশিক হয়তো তাকে পাখিপড়া করিয়েছে, আবার না কি ফ্যাসাদে পড়ে বেচারি। কৌশিক যে তার খুব শুভকাঙ্ক্ষী নয় এটা সুমতি বেশ জানে।

অত কথার উত্তর দেবার মতো বল পায়নি তখনো অরবিন্দ। থেমে থেমে মাঝখানে বলল। কেন এসেছিল তার উত্তর দিল কৌশিক একটু জমিজমা যদি সুবিধে মতো পায়; তাই টাকাগুলোও এনেছিল। মাথায় কি করে লাগল? কৌশিক একটা কি বলতে যাচ্ছিল, অরবিন্দ হঠাৎ স্পষ্ট গলায় একটু যেন জোরেই বলে বসল 'মেরেছিল। সবাই চমকে উঠল। মেরেছিল? কে মেরেছিল? —কৌশিককে দেখিয়ে অরবিন্দ বলল ঐ 'ও'। 'কেন মেরেছিল ততক্ষণে কৌশিক উঠে দাঁড়িয়েছে 'আমি মেরেছিলাম? মিথ্যাবাদী!' ডাক্তার কৌশিকের হাত চেপে ধরলেন। 'অরবিন্দ আরো বলতে লাগল। আমিই ওকে মারব বলেছিলাম। ও আমাকে ভয় পায়, তাই ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি পড়ে গেলাম।'

এই অবধি শুনে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতুলবাবু উঠে পড়লেন। 'চলুন ডাক্তারবাবু, বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা প্রাইভেট ব্যাপার এর মধ্যে আবার আমাদের মতো বাইরের লোকের থাকা কেন?' তাঁরা গেট দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই বরুণা

খেঁকিয়ে উঠল তবে যে বললে কৌশিক মেরেছিল, মিথ্যুক : ছোটবেলা থেকে খালি ওকে মারো আর ভালোমানুষ সেজে থাক। মার দেখি ; আমাকে না মেরে কৌশিককে মারতো যদি পারো।'

চেঁচামেচি শুনে বাকিরা চাতালে বেরিয়ে এল। দরজার ওপরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, দূর থেকে দেখলে মনে হয় বুঝি নাটক হচ্ছে। গেটের বাইরে রিক্সা থেকে নেমেই পাকা আমের মতো দেখতে বুড়ো ভদ্রলোকেরও ঠিক তাই মনে হল। সবাই নাটক দেখতে ব্যস্ত, নবাগতের মঞ্চে আরোহণে কেউ বাধা দিল না।

বরুণা কৌশিককে সবার সামনে জড়িয়ে ধরেছে। অরবিন্দ কি যেন বলবার চেষ্টা করছে। বুড়ো ভদ্রলোক একেবারে সামনে এসে হাতের ছড়ি তুলে কৌশিককে বললেন 'স্কাউনড্রেল' আশালতা অস্ফুট আর্তনাদ করে সামনে যে চেয়ারটা ছিল তাতে বসে পড়ল।

বুড়ো ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত কষে বললেন, 'রাস্কেল! বড়লোক হবার তালে ছিলি, স্ত্রীধনে ভাগ বসাবি ভেবেছিলে? সে গুড়ে বালি!' তারপর আশালতার দিকে চোখ পড়াতে, তেড়িয়া হয়ে উঠলেন, 'ও কি হচ্ছে? খবরদার যদি ভির্মি গেছিস্!—' আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বিনিপিসিকে দেখতে পেলেন। এক মুহূর্তে তাঁর চেহারা বদলে গেল, সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, 'একি আমি ভূত দেখছি নাকি?' তারপর এক লাফে বিনিপিসিকে বুকে জড়িয়ে ধরে গাঢ়স্বরে বললেন, 'মা তুই বেঁচে আছিস্ তা হলে! কত খুঁজেছিলাম রে। মিসেস্ বিশ্বাস বললে মরে গেছিস! আঃ বুকটা জুড়ুল, মা।' বিনিপিসিও সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়ে বুড়োর বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন। বুড়ো খালি তাঁর পিঠে হাত বুলোন আর বলেন, 'সবাই গেছে মা, তোকে কষ্ট দেবার, তাড়িয়ে দেবার আর কেউ বাকি নেই রে!' একবার মুখ তুলে বিনিপিসি বললেন 'উর্মি?'

'শুধু সে-ই আছে, আরে সে লক্ষীছাড়িই তো যত নষ্টের গোড়া।

বিমান যখন তাকে বিয়েই করে ফেলেছে, আমার আর কিছু বলা শোভা পায় না।'

আশালতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হলেন, হিস্টিরিয়া নয় তো? কিন্তু আশালতা যে আনন্দে হাসছে সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। বুড়োকে যখন সবাই চেপে ধরল, সব খুলে না বললে কি করে হয়? ডাক্তারবাবু একবার উদ্বিগ্নভাবে অরবিন্দের দিকে তাকালেন। সে বলল, 'না, ওঁকে বলতে দিন।' বরুণা ফোঁপাতে লাগল।

বুড়ো তখন তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও কিছু কম যাও না, আমি তোমাদের অন্য রকম ভাবতাম। অরবিন্দ, তোমার মার কথা শুনে আমার প্রায় নাড়ি ছেড়ে গেছিল। তাই বিমান আর উর্মিকে কিছু না বলে চলে এলাম। এখানে একটা এত বড় অন্যায় হতে যাচ্ছে, সেটা বন্ধ করা দরকার। তাছাড়া অনেক দিন পরে বিমান উর্মি সুখের মুখ দেখেছে, ওখানে আর আমার কোনো কাজ নেই, কে যেন বুড়োকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। বসে পড়ে বললেন, সুমতি শোন, গল্পের মতো শোনাবে। গোড়া থেকেই বলি তাহলে। আমার নাম উমানন্দ রায়। আমার বন্ধু অসিত ঘোষচৌধুরীর স্ত্রী ছিল না, শুধু এক ছেলে কিশোর, অতি লম্পট, অতি নিষ্ঠুর আর তার ছেলেমানুষ রূপসী বৌ উর্মি আর এক মেয়ে বিনতা। আহ্লাদ দিয়ে ছেলেমেয়ের মাথা খেয়েছিল অসিত। অঢেল টাকাকড়ি তাদের দুজনকেই নষ্ট করেছিল। বিনতা অবনীশ লাহড়ী বলে একজন হকি প্লেয়ারের সঙ্গে পালিয়ে গেল। তখন তার সতেরো বছর বয়স। অসিত জীবনে আর তার নাম করেনি। পরে শুনেছিলাম অবনীশ তাকে ত্যাগ করে, আবার বিয়ে করেছে আর সে নাকি বেঁচে নেই।

কিশোর পঁচিশ বছর বয়সে অতি জঘন্য জায়গায় মারামারি করে মরে গেল। অসিত ঘোষচৌধুরী দিল্লীর বাস তুলে দিয়ে সিমলের

কাছে মসুমপুরে তার সুন্দর বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটাল। আগেও মাঝে মাঝে সেখানে যেত, সঙ্গে থাকত বিনতা, কিশোর, উর্মি। এখন শুধু বিধবা উর্মি। আমারও সেখানে বাড়ি আছে, আমি ও আমার ছেলে বিমানকে নিয়ে ছুটি পেলেই ওখানে যেতাম।

দিল্লীতে ডাক্তারি করতাম; রিটায়ার করে আমিও অসিতের কাছাকাছি কায়েমী হয়ে বসলাম। বিমান ততদিনে ডাক্তার হয়েছে, সুযোগ পেলেই মসুমপুরে আসত। তারপর তার বিয়ে হল, সরকারি চাকরি নিল, আর মসুমপুরে আসা হত না। পরে তার স্ত্রী মারা গেল, বিমান ততদিনে সিভিল সার্জন হয়েছে, একটিমাত্র মেয়ে তাকে আমি পেতনি বলি। তারপর আমাদের সব সুখ ঘুচে গেল; বিয়ের এক বছরের মধ্যে পেত্নি বিধবা হল, বিমান চাকরি ছেড়ে; কদিন এদিকে ওদিকে ঘুরে; মসুমপুরে আমার কাছে এল। ততদিনে অসিতও মারা গেছে, একদিন সকালে বাগানে বসে বসে, হাতে গড়গড়ার নল নিয়ে দিন কেটে যেতে লাগল। পেত্নি বাড়ী ছেড়ে, পড়াশুনো ধরল, অনেকগুলো পাশটাশ করল, রিসার্চ করতে লাগল সরকারি বৃত্তি নিয়ে। উর্মির শরীর খারাপ হয়ে গেল, বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না, সিমলা থেকে ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করায়। আর একজন দূর সম্পর্কের ভাইঝি এসে পিশির দেখাশুনো করে। ভাইঝির নাম বরুণা।

উমানন্দ একবার উপস্থিত সকলের মুখ দেখে নিলেন। 'আজ থেকে ঠিক ছয় মাস আগে, সে আর বেশি বাঁচবে না ভেবে উর্মি এক উইল করল। আমাকে সাক্ষী হতে ডেকেছিল। সব সম্পত্তি বরুণাকে দিতে চায়। আমি বাধা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম অসিতের মেয়ে নবীনা মারা যাবার আগে তার একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়েকে নবীনার মা'র একজন খ্রীষ্টান বন্ধু মানুষ করেছিলেন। মিশন স্কুলের বোর্ডিংএ তার প্রথম জীবনটা কেটেছে। এই অবধি জানতাম। ভদ্রমহিলা লেডি ডাক্তার।

আমি তাঁকে চিনতাম। তিনি মারা যাবার আগে আমাকে নবীনার মেয়ের বিষয়ে জানিয়ে ছিলেন। উর্মির উইলের কথা শুনে আমি বলেছিলাম, অসিতের মেয়ের মেয়ে বেঁচে থাকতে উর্মির ভাইঝিকে অসিতের সম্পত্তি দেওয়া ঠিক হবে না। তখন উর্মি সে উইল ছিঁড়ে ফেলে নতুন উইল করল। কারো পরামর্শ শুনল না। নতুন উইলে লিখল নবীনার মেয়ে যদি তখনো বেঁচে থাকে, তা হলে সে-ই সব সম্পত্তি পাবে, যদি উর্মির মৃত্যুকালে সে অবিবাহিত থাকে। উর্মি বেঁচে থাকতে তার বিয়ে হলে, সে কিছু পাবে না, বরুণাই সব পাবে। উকীল সেই রকম লেখা পড়া করে দিয়ে, নবীনার মেয়ের সন্ধান নিতে লাগল। অবিশ্যি যাবার আগে বরুণার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে গেল। বরুণা বোধহয় উইলের কথা কিছু জানে না।

নবীনার মেয়ের সংবাদ পাওয়া খুব শক্ত ছিল না। মিসেস্ বিশ্বাস গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মেয়ে মিস্ বিশ্বাস ঐ মিশন স্কুলের বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল। তার নাম সুমতি।

বাকি থাকে উর্মির জীবনকালে, অর্থাৎ অচিরাৎ সুমতির বিয়ে দেওয়া। তা হলে বরুণা হয় ওয়ারিশ, বরুণার স্বামী হয় বড়লোক। সুমতির জন্য একজন পাত্রও ঠিক হল। তার নাম অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তারাও ঐ অঞ্চলের প্রবাসী বাঙ্গালী। তাদের অনেক বনজঙ্গল, সে সব ডেভেলপ করতে পারছে না মূলধনের অভাবে।

ঐ উকীল অরবিন্দের পুরোনো বন্ধু, তার কাছে কিছু মূলধনের সন্ধানে অরবিন্দ গেলে পর, উকীল এই বিয়ের সম্বন্ধ করে। কিন্তু একটু পাল্টিয়ে বলে। বলে উর্মির উত্তরাধিকারিনী সুমতি; যদিও সে কিছুই জানে না। মিশন স্কুলে মানুষ, দুনিয়ার হালচালও সে কিছুই জানে না, তার হৃদয় জয় করা খুব শক্ত হবে না। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনাই নেই। উর্মিদেবী মৃত্যু

শয্যায়, একরকম বলতে গেলে। মূলধন আপনা থেকেই হাতে এসে যাবে।

ঐ উকীলের নাম কৌশিক রায়।

তিন মাস আগে বরুণা যখন এখানে কাজ নিয়ে এল, পেতনিকে কথাটা জানাতে হল, নইলে কন্দীবাজদের হাত থেকে কে সুমতিকে বাঁচাবে? সব ব্যবস্থা করে এখানে আসতে পেত্নির প্রায় তিনমাসই লেগে গেল। তারি মধ্যে শুনলাম কৌশিক রায় তার গুরুদেবের সঙ্গে এখানে আসচে। খোঁজ নিয়ে জানলাম অরবিন্দ মুখার্জিও সঙ্গে আসছে। তখন ওর মাকে লোক পাঠিয়ে আমদের বাড়িতে আনিয়ে তার কাছে শুনলাম কৌশিক নাকি অরবিন্দর বিয়ের বন্দোবস্ত করছে, পয়সাওয়ালা জায়গায়। অমনি জলের মতো সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন না এসে আর করি কি? ওহে শ্রীমান অরবিন্দ সুমতিকে বিয়ে করলে এক পয়সাও পাবে না।'

অরবিন্দ বললে, 'জানি। আগেই শুনেছিলাম, মা চিঠি দিয়েছিলেন। তাই নিয়েই কৌশিকের সঙ্গে মারামারি। আমাকে মিথ্যা বুঝিয়েছিল বলে।'

উমানন্দ লাফিয়ে উঠলেন 'মারামারি?' মাই ডিয়ার বয়, হতভাগাকে মেরেছ নাকি?'

বরুণা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'মেরেছে না আরো কিছু! নিজেই পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে। ছোটবেলা থেকে ওর খালি হাত ভাঙ্গে, ঠ্যাং ভাঙ্গে, হাঁটু ছেঁচে যায়। বললেই হল মেরেছে!'

আশালতা ডাকলে—'সুমতি।'

সুমতি পাথরের মূর্তির মতো অরবিন্দের পাশে বসে।

আশালতা বললে 'সব শুনলে তো?'

অরবিন্দ বললে, 'সব শুনেও যদি সুমতি, তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি কৃতার্থ হব। আমার পয়সা কড়ি নেই, ঐ পাঁচ হাজার

আমার যথাসর্বস্ব। কিন্তু তুমি আমাদের বাড়িতে এলে, মা আর আমি দুজনেই সুখী হব।'

কৌশিক কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ফুল্!'

উমানন্দ চটে গেলেন, 'আসল ফুল্' তুমি নিজে। উর্মি তার ডাক্তারকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বিমান ওকে সারিয়ে তুলেছে, বিমানের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে; যা হওয়া উচিত ছিল কুড়ি বছর আগে, সে হতভাগা মরলে পরই। এবং ঐ উইল উর্মি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে আরো ত্রিশ বছর বাঁচবে, তোমরা কেউ কিচ্ছু পাবে না।'

অরবিন্দ হঠাৎ বলল, 'পেত্‌নি কে?'

উমানন্দ অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, পেত্‌নি আমার নাত্‌নি, তার ভালো নাম আশালতা।' সকলে হেসে ফেলল। কোথায় যেন একটা বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেল; সবাই যেন নিশ্চিন্ত হল। বরুণা কৌশিককে একটা হীরের আংটি ফিরিয়ে দিয়ে রাগতভাবে বলল, 'কিছুই যখন পাবে না, তখন বোধ হয় এটা ফিরিয়ে চাও?'

কৌশিক আংটিটা আবার শক্ত করে ওঁর আঙুলে এঁটে পরিয়ে দিয়ে বলল, 'কিছু পাচ্ছি না আবার কি? সুন্দরী, এম-এ পাশ বৌ পাচ্ছি, পোটেন্‌সিয়েল চাকুরে। খালি এখানকার চাকরি ছাড়িয়ে সিমলেতে কোথাও ঢোকাতে হবে। এখানে তো আর থাকবে না।'

আশালতা প্রসন্ন হেসে বলল, 'আমি এখানে থাকব। ছুটিছাটায় বাড়ি যাব।'

আশালতা আশ্চর্য হয়ে বলল 'তোমার আবার ছুটিছাটা কি, দাদু?'

'আহা তোর ছুটিছাটাতে বাড়ি যাব। তাইতো বলছি।'

তারপর কৌশিক আর বরুণা চলে গেলে পর আশালতা বলল, 'সুমতি', অরবিন্দের কথার উত্তর দিলে না যে?'

উমানন্দ বললেন, 'ও আবার কি কথা, পেত্‌নি? সুমতি যাতে

অরবিন্দকে বিয়ে না করে, তাই না তোকে এখানে পাঠানো হয়েছিল।'

আশালতা হাসল, 'ও কি আমার কথা শুনবে?'

ঠাণ্ডা পড়ছে। ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন। অরবিন্দ নিজের ঘরে গেল। ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। নার্স সুমতিকে ডেকে দিয়ে, স্নান করতে গেল!

অরবিন্দ বলল, 'কিছু বললে না সুমতি?' সুমতি বললে, 'আমি কালো।' 'আমি কালো ভালোবাসি। সুমতি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। যখন লুকিয়ে এসে তোমার ঘরে ফুল রেখে গিয়েছিলাম, তখন তোমাকে ভালোবাসি নি। কিন্তু তুমি যখন পথ থেকে তুলে এনে আমাকে প্রাণ দিলে, কি যেন হল আমার, তোমাকে ভালোবাসলাম।'

সুমতি কেঁদে বললে, 'আগে তো কেউ আমাকে ভালোবাসেনি।' হঠাৎ নিমকুঝির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুমতি বললে, 'তা ছাড়া—' 'তা ছাড়া কি, সুমতি? বিনিপিসি তোমার মা, এই তো? উমানন্দ রায় যেই বললেন, তুই বেঁচে আছিস। অমনি সব বুঝতে পারলাম। আমি যে ব্যাপারটা জানি; আমরা যে ওখানকার লোক।'

আরো অনেক রাতে, চাতালে বসে বিনিপিসি ডাক্তার উমানন্দকে বলছিলেন, 'নিজের মেয়ে পরকে দিয়ে দিলাম, মানুষ করার সাধ্য ছিল না, কাকাবাবু। গয়না বেচে সেক্রেটেরিয়েল কোর্স নিয়ে, সারাজীবন চাকরি করে খেয়েছি মেয়ের খরচ পাঠিয়েছি; অন্য মানুষ হয়ে গেছি, নাম বদলে ফেলেছি, সব সৌখীনতা ভুলে গেছি; কাকাবাবু, বড় কষ্টে জীবনটা কেটেছে। এতদিনে মনে শান্তি পেয়েছি। ওকে কি করে বলি? আমি যে মিসেস্ বিশ্বাসকে কথা দিয়েছিলাম মেয়ের একুশ বছর বয়স অবধি কোনো সম্পর্ক রাখব না। উনি বলেছিলেন আমাদের রক্তই বিষাক্ত, আমাদের প্রভাব

বিষময়। আমি আসা-যাওয়া করলে উনি মেয়ের ভার নেবেন না। আপনি তো জানেন কাকাবাবু, বাবা আমার মা'কে কি কষ্ট দিয়েছিলেন। দাদাও উর্মিকে।—সত্যি আমরা ভালোনা। তারপর ওর একুশ বছর হলে কাছে আনলাম, কিন্তু পরিচয় দিতে সাহস হয়নি। ওর চোখ দুটি কি স্বচ্ছ দেখেছেন কাকাবাবু? কালিঘাটে অবনীশ আমাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। চলে যাবার সময় বলেছিল ওর ওপর আমার কোনো দাবী নেই কারণ ও বিয়ে বিয়েই নয়। কি করে বলি, সুমতিকে সে কথা?

উমানন্দ চটে গেলেন, নিশ্চয় বিয়ে। ব্যাটা মরে গেছে, নইলে মেরেই ফেলতাম।' ঠিক সেই সময় সুমতি এসে বিনিপিসির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ডাকল, 'মা।'

আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ স্থির হয়ে রইল। উমানন্দের উঠে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বসে রইলেন।

পঞ্চমী পুরাণ

শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করেই তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চমীদিদি চাপা গলায় বললে—'এবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ সত্যি করে কেউ আমার পাছু নিয়েছে কি না।'

বই বন্ধ করে উঠে এলাম, ভাবলাম এতে যদি পঞ্চমীদিদির মনগড়া ভয়গুলো কিছুটা কমে তাহলে হয়তো আমি নিজে একটু মন দিয়ে পড়ার সুযোগ পাব, পরীক্ষার তো আর খুব বেশি দিন দেরি নেই। আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে পঞ্চমীদিদি বললে, 'ঐ দেখ. ঐ।'

সত্যিই মনে হল ছায়ার মতো কি একটা রাস্তার গ্যাসবাতির তলা থেকে সরে গেল। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমার জ্বালায় কি পথ দিয়ে লোক চলবে না?'

পঞ্চমীদিদি খাটে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে চুলের গোড়ার বাঁধন আলগা করতে করতে বলল 'তুমি তো বিশ্বাস করবে না কিছুই, কিন্তু আমি টের পাচ্ছি আমার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে।'

'কিসের আবার—ষড়যন্ত্র!'

ফ্যাকাসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পঞ্চমীদিদি বললে—'আমাকে সরাবার জন্যে, আমার—আমার—'

গলা বন্ধ হয়ে গেল, আর কথা বেরুল না, খালি হাত দুটো কেবলি একসঙ্গে পাকাতে লাগল। ধরে দেখলাম বরফের মতো ঠাণ্ডা। ভয়ের কারণটা যতই না মনগড়া হোক, ভয়টা যে প্রকৃত সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তাকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে বললাম—

'তুমি রোজই বল কে তোমার সঙ্গ নেয়, কে ভিড়ের মধ্যে থেকে তোমাকে গাড়ির চাকার দিকে ঠেলে দেয়, ছাদের ওপর থেকে ইট খসায়, গাছের ডাল ভেঙ্গে ফেলে ইত্যাদি। কিন্তু তুমি মলে কার কি সুবিধাটা হবে শুনি? তোমার আছে কি?'

পঞ্চমীদিদি রেগে গেল, গায়ের চাদরটা আরেকটু ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি জানি আমি গরীব, আমি একটা নিরাশ্রয় বিধবা, তোমার মাসির বাড়িতে থেকে তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করি, চল্লিশটি টাকার জন্যে। সেইজন্যে তুমি আমাকে যথেষ্ট ঘেন্নাও কর—কিন্তু তাই বলে কেউ আমাকে মেরে ফেলতে ক্রমাগত চেষ্টা করবে আর তুমি সেটা হেসে উড়িয়ে দেবে, এই কি তোমার উচিত হল?'

মুখের ওপর আঁচল ঢাকা দিয়ে পঞ্চমীদিদি ভয়ে দুঃখে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। তখনকার মতো পড়াশুনোর আশা ছেড়ে তাকে বোঝাতে বসি।

'হেসে ওড়াব কেন পঞ্চমীদিদি, তোমার ভয়ের যে কোনো ভিত্তি নেই, তাই দেখাতে চেষ্টা করছিলাম। তোমাকে কেউ চেনে না জানে না, তুমি কোথাও যাও না, কারো অনিষ্ঠ কর না, তোমার কেন শত্রু থাকবে বল। প্রতি শনিবার দুপুরে মাসির সঙ্গে সুকু, মালা আর মেমি তাদের দিদিমার কাছে গেলে তুমি মোড়ের মাথায় বেলা আড়াইটার ফিল্ম দেখে আসো। আর রোজ ফিরে এসে বল কে তোমাকে মারবার চেষ্টা করছে। তুমি নিজেই বল কথাটার কি কোনো মানে হয়?'

পঞ্চমীদিদি চোখ থেকে কাপড় নামিয়ে ফোঁস করে ওঠে—'রোজ বলি মানে? আগে বলিচি কখনো? এই মাস দুই ধরে যেরকম ঘটচে তাই বলছি। বেশ, তাতে তোমার যদি অতই বিরক্ত লাগে আর বলব না। সত্যিই তো আমি মরলে কার কি এসে যায়।'

অনাবশ্যকভাবে পঞ্চমীদিদি তার নিজের আর আমার নেয়ারের

খাটের উপরে আমার নিজের হাতে পরিষ্কার করে পাতা বিছানা ধরে টানাটানি করতে থাকে। আমি বই নিয়ে আবার বসি। একটু ভালো করে পড়লেই ভালো ফল হবে, কলেজের স্কলারশিপটা অন্তত পেতে পারব, এম-এ পড়ার কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে আর এখানে থাকতে হবে না, আমাদের কলেজের হোস্টেলেই ফ্রী থাকতে পারব, স্কলারশিপ দিয়ে এম-এ পড়ার খরচ চলে যাবে। আর কারো কাছে সাহায্য চাইতে হবে না।

পঞ্চমীদি ঘরময় ঘুরঘুর করতে থাকে, চুল খোলে, জুতো ছেড়ে চটি পরে, ব্যাগ নামিয়ে রাখে। আর ক্রমাগত নিজের মনে বকতে থাকে—

'গরীব বৈকি কিন্তু তাই বলে যে একেবারে কিছুই নেই তাই বা কি করে বলি। তবে সে তো আর আমি জোর করে আদায় করি নি। দশ বছরের কাজে খুশি হয়ে মনিব যদি কিছু দেয়, সেটা কি একেবারে কিছুই নয়? একটা সামান্য রূপোর হাঁসুলির জন্যে মানুষের প্রাণ গেছে বলে কত সময় শোনা যায় আর এতো উলুবেড়ের রেলস্টেশনের থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে দু'কাঠা জমি। তাই কি একেবারে কিচ্ছু না হয়ে গেল?'

না হেসে পারি না।

'তোমার দু'কাঠা জমির জন্যে তোমায় দুষ্টুলোকে খুন করবে পঞ্চমীদিদি আর বুড়ো দাদুর পাঁচশো বিঘার জন্যে তাঁকে করবে না?'

পঞ্চমীদিদি রেগেমেগে কোনো উত্তর না দিয়ে তার নেয়ারের খাটটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে এক হাত সরিয়ে, তার ওপরে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর থেকে ছাদের একটা টালি খুলে ঠকাস করে মেঝেয় পড়ে খান্‌খান্ হয়ে গেল। আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মুখে বললাম—'কি, অমন সাদা মুখ করে দেখছ কি? পুরোনো বাড়িতে এ রকম হয়েই

থাকে। তাছাড়া ওটা তো আমার মাথাতেও পড়তে পারত। ওকি, বিছানা গুটিয়ে চললে কোথায়?'

পঞ্চমীদিদি বললে—'আর নয়। আজ থেকে তোমার মাসির সুকুদের ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শোব। ও ঘরের দতুন ছাদ, তার টালি তো আর খসবে না! বাবা! ঘরের ভেতরেও নিস্তার নেই!'

পঞ্চমীদিদি চলে গেলে পর টানা তিন ঘণ্টা নিরিবিলি পড়া-শুনোর সুযোগ পেলাম। রাত ন'টায় ছেলেমেয়ে নিয়ে মাসি ফিরল তিরিক্ষি মেজাজে, মায়ের সঙ্গে কিছু খিটিমিটি লেগে থাকবে। মেসোমশাই তখনো ক্লাবে। বর্ষার মেঘের মতো মুখ করে আমার ঘরে এসে বলল মাসি, 'পঞ্চমীকে নিয়ে তো আর পারা গেল না। দেখি সুকুদের ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছে, না কি তার শরীর খারাপ! তোমার সঙ্গে কিছু হয়েছে বুঝি? নিজের বাড়িতেও কি এতটুকু শান্তি আশা করতে পারি না? ছেলেপিলের ঘরে ওসব অশিক্ষিত লোকের শোয়া আমি পছন্দ করি না।'

আমি বললাম, 'আমার সঙ্গে কিছুই হয় নি। ছাদ থেকে টালি খসে পড়েছে দেখে ভয়ে সে ওঘরে গিয়ে শুয়েছে।'

মাসি বিরক্ত হয়ে একবার ছাদের দিকে একবার মেঝের ওপরে ছড়ানো ভাঙা টালির টুকরোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তা পড়া আর আশ্চর্য কি? যে রকম খাট টানাটানি কর তোমরা, গোটা ছাদটা যে পড়ে নি তাই ভাগ্যি। তখন থেকে ঘরে বসে রয়েছে, এগুলো ঝেঁটিয়ে তোলবার সময় পাও নি? নাকি কলেজে পড়া মেয়ে ঝাটা ধরতে অপমান লাগে?' এই বলে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে মাসি নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিল। পঞ্চমীদিদি ওঘরে মালা মেমির জামা ছাড়াতে ছাড়াতে টালি খসার গল্প করছে কানে এল অনেক রাতে মেসোমশাই ক্লাব থেকে ফিরলেন, আমি উঠে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে গেলাম। বাড়িতে কি হয় না হয়, ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে পারেন না।

পরদিন সকালে টালি খসার জের টেনে মাসি খুব রাগদাগ করতে লাগল। বাড়িটা তার বাবা যখন তাকে লেখাপড়া করে দিয়েছিলেন, তখন তো ভালোই ছিল, তবে রাখতে না জানলে কোন জিনিসটাই বা থাকে? দায় শুধু যে ট্যাক্স দেয় তার; যারা নিশ্চিন্ত আরামে বাড়িতে বাস করে দুবেলা খায় দায়, রাতে ছাপর খাটে শুয়ে ঘুম লাগায়, তাদের কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

ঘরে আমি ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ ছিল না, কাজেই ঠেসটা যে কাকে দেওয়া হচ্ছে সে আর আমার বুঝতে বাকি রইল না। মেসোমশাই ডিম টোস্ট খেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেছেন, সারাদিন এমুখো হবেন না, পুরোনো এটর্নির আপিস, কাজের আর অন্ত নেই। তারপর কাজ শেষ হলে মিত্র সাহেবের বাড়িতে ব্রিজ্‌ খেলা চলে রাত সাড়ে দশটা অবধি। ততক্ষণে এ-বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে, মেসোমশাই খালি ঘরে একা বসে খাওয়া-দাওয়া করেন আমি একটু দেখাশুনো করি। হারু খানসামা তাঁকে খাইয়ে তারপর রান্নাঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে গুদোমে শুতে যায়।

এতদিন এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। আজ মাস দুই থেকে পঞ্চমীদিদির পেড়াপিড়িতে আমি রোজ রাতে রান্নাঘরের পাশে বাসনের ঘরের ছিটকিনিটি তুলে দিই, নইলে সেও ঘুমবে না আর আমাকেও পড়তে দেবে না, আজ ভোরে অম্বলের ব্যথা সইতে না পেরে একটু গরম জলের খোঁজে নিচে এসে ছিটকিনি তোলা দেখে মাসি রেগে চতুর্ভুজ! এ-দরজায় কোনোদিন ছিটকিনি দেওয়া হয় না, তার বাপের আমলেও হত না, এখন যত সব বাইরের লোক বাড়ির পুরোনো নিয়মগুলো পাল্টাতে আরম্ভ করেছে দেখা যাচ্ছে। খবরদার যেন কেউ এ দরজার হাত না দেয়। সবাই মনে ভেবেছে কি ইত্যাদি কি না বলে যায় মাসি!

পঞ্চমীদিদি তখনো ছেলেমেয়েদের ঘর থেকে বেরোয় নি, কাজেই ঝালটা পড়ল আমার ওপর। তাছাড়া আমিই যে ছিটকিনি

ভুলেছি এটাও ঠিক। পড়ব কি, এমনিতেই মেজাজ মন্দ, তায় বুক জ্বলুনি, মাসির বকুনি আর থামতে চায় না। চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম; আপনা থেকেই বকুনি এক সময় থেমেও যেত, মাঝখান থেকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পঞ্চমীদিদি বলে বসল, 'ওর দোষ নেই, আমিই বন্ধ করতে বলেছি।'

মাসি এমনি অবাক হয়ে গেল যে, কথার স্রোত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মাসির মতোই পঞ্চমীদিদিও একবার কথা বলতে সুরু করলে থামতে পারে না, পাঁচ মিনিটে গত দুই মাসের মধ্যে তার প্রাণহানির জন্যে ক'বার চেষ্টা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণী দিয়ে, টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইল, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাসি গরম জলের ব্যাগ হাতে করেই সবচেয়ে কাছের চেয়ারটাতে বসে পড়ল।

ততক্ষণে সুকু, মালা আর মেমিও নিচে খেতে এসেছে, পঞ্চমী-দিদির শেষ কথাগুলো তারা হাঁ করে গিলছিল, সে থামতেই সুকু বলল, 'সিঁড়িতে সুতো বাঁধার কথা বললে না।'

মাসি বলল, 'সে আবার কি?'

সুকু আর মালা একসঙ্গে বলে উঠল, যারা পঞ্চমীদিকে খুন করতে চায়, তারা একদিন রাত্রে সিঁড়িতে টনসুতো বেঁধে রেখেছিল, যাতে হোঁচট খেয়ে একতলায় পড়ে পঞ্চমীদিদির মাথা চৌচির হয়ে ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়ে। তখন পটের মাও আমাদের দেখাশুনো করবে না আর মেনিমুখ টুনিদিদিও নয়।

এই বলে তারা দুজন এমন করে হাসতে লাগল যে সবাই আঁচ করে নিল কথাগুলো কার? পঞ্চমীদিদির নড়বার চড়বার ক্ষমতা চলে গেছিল, ঠিক সেই সময়ে মাসির ফিক্ ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে না উঠলে হয়তো একটা বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যেত। মাসি একটা গোঙানি শব্দ করে টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ল, আর আমরা জল রে বরফ রে করে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। আধ ঘণ্টা বাদে

মাসির মাদ্রাজি আয়া লছমি এল, তার কাছে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তবে বই নিয়ে বসতে পারলাম। মাসি ততক্ষণে কপালে জলপটি দিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছে, লছমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের পাশে মোড়ায় বসে ক্রুশ বুনতে সুরু করে দিয়েছে।

তারপর ছেলেমেয়েদের স্কুলের বাস এসে গেল, আমিও স্নান করে চারটি মুখে দিয়ে কলেজের দিকে রওনা হলাম। পরীক্ষার তারিখ গিয়ে জেনে আসা দরকার। মেসোমশাইকে লছমি টেলিফোন করে মাসির শরীর খারাপের কথা জানিয়েছিল, সন্ধ্যের আগেই তিনি এসে অনেকক্ষণ মাসির ঘরে বসেছিলেন। আরো অন্ধকার নামলে পর আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন।

মেসোমশাই লোকটি ভারি সুপুরুষ, বছর পঞ্চান্ন বয়স হয়েছে, এখনো চেহারার জৌলুস যায় নি। কৃতী এটর্নি, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালোবাসেন, মাসি কোথাও সঙ্গে যাবেন না কিছুতেই, কাজেই একাই পার্টিতে যান, তাই নিয়ে নিন্দুকরা খোঁটা দিতেও ছাড়ে না। মাসি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; মাসির চেয়ে দশ বছরের বড় মেজমাসির সঙ্গে আগে বিয়ে হয়েছিল, বছর পনেরো হল মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মেজমাসি মারা গেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েকে মাসি বোর্ডিং-এ রেখে মানুষ করেছে, তাই নিয়েই নিজের মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি লেগে আছে।

বুড়ো দাদু থেকে থেকে মধ্যস্থতা করে মিটমাট করিয়ে দেন, আবার কিছুদিন বাদে মন কষাকষি সুরু হয়ে যায়। মেসোমশাই সব কিছু থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। এ-বাড়িতে বুড়ো দাদুই আমাকে এনেছেন, তখন মেজমাসি বেঁচে ছিলেন। তাঁকে আমার একটু একটু মনে পড়ে। তিনি মারা যাবার সময় আমার চার বছর বয়স তাঁর যমজ ছেলেমেয়ে সাগর আর সোনালি আমার সমবয়সী, তারা এতকাল শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনো করছে, ছুটিতেও এ-বাড়িতে আসতে চায় না, দিদিমার কাছে যায়।

বুড়ো দাদু দিদিমার কি রকম ভাই হন, এককালে ভারি বড়লোক ছিলেন, তারপর ব্যবসা করতে গিয়ে সব খুইয়েছেন, থাকার মধ্যে আছে উলুবেড়ের জমিটুকু আর একটা লক্ষ্মীছাড়া বয়ে যাওয়া ছেলে, মোদো-মাতাল, আর চরিত্রের যা ছিরি সে বিষয় আর কিছু না বলাই ভালো। এসব মেসোমশাইয়ের কাছে শোনা, আমি নিজে তাকে চোখেও দেখি নি। মাঝে কিছুদিন আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করবার তালে ছিলেন বুড়ো দাদু, হয়তো ভালো মনে করেই, আমার যাতে একটা হিল্লে হয়ে যায় এই ভেবে। কিন্তু আমি এমনি তেড়িয়া হয়ে উঠেছিলাম, যে শেষ পর্যন্ত মেসোমশাই ও বিষয় নিয়ে কোনো কথা পাড়তে মানা করে দিয়েছিলেন।

তবু বুড়ো দাদুকে ভালোই বলতে হবে যে, সে জন্যে আমার ওপর কোনো আক্রোশ রাখেন নি, বরং আমাদের না জানিয়ে প্রায় তিন মাস আগে পঞ্চমীদিদির আর আমার নামে উলুবেড়েতে তাঁর নিজের জমি থেকে দু'কাঠা করে জায়গা একেবারে লেখাপড়া করে দিয়েছেন, যাতে তেমন তেমন অবস্থা হলে আমাদের দাঁড়াবার একটা জায়গা থাকে। আমি অবিশ্যি যখন কথাটা শুনেছিলাম, তখন লেখাপড়া সব হয়ে গেছে; খুব আপত্তি জানিয়েছিলাম দুজনেই। পঞ্চমীদিদি প্রথমটা বোধ হয় খুশিই হয়েছিল, পরে আমার দেখাদেখি সেও রাগ দেখাতে লাগল। শেষটা অনেক কষ্টে মেসোমশাই আমাদের ঠাণ্ডা করলেন, এই বলে যে আমরাও উল্টে আমাদের যথাসর্বস্ব বুড়ো দাদুকে উইল করে দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চোকে।

বুড়ো দাদুর বয়সটা সত্তরের কাছাকাছি হবে, কাজেই কথাটা বেশ হাস্যকর। তবু সত্যি আমরা দুজনেই মেসোমশাইকে দিয়ে ঐ রকম লেখাপড়া করিয়ে রাখলাম। এই ঘটনার দিন পনেরো পর থেকেই, পঞ্চমীদিদির ধারণা হল যে, কেউ ওকে খুন করবার চেষ্টা

করছে, বোধ হয় ঐ দু'কাঠা জমির লোভেই। অবিশ্যি মুখে এ-কথা সে একবারও বলে নি।

বুড়ো দাদুকেই এক রকম আমার গার্জিয়ান বলতে হবে, যদিও উনিশ বছর বয়স হয়ে গেছে আমার, আইনতঃ আমি সাবালিকা। আসলে যে কথাটা এতক্ষণ গোপন করছিলাম, সেটি হল যে ১৯৪৬ সালের হাঙ্গামার সময় পূর্ববাংলার একটা লুটপাট করা ভাঙাচোরা শূন্য বাড়ির গোয়ালঘরের মাচার ওপরে, একটা ছালার মধ্যে আরো পাঁচটি আফিং খেয়ে বেহুঁশ শিশুর সঙ্গে আমাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সমাজসেবকরা আমাদের উদ্ধার করে এনেছিল আর দয়া করে যে সব দেশবাসীরা আমাদের মানুষ করবার ভার নেবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন, বুড়ো দাদু তাঁদের মধ্যে একজন।

নিজের ঘরে কোনো মেয়েছেলে ছিল না, তাই আমাকে তিনি এক নিকট আত্মীয়ার কাছে দিয়েছিলেন ; বহু বছর সমস্ত খরচপত্রও দিতেন, তারপর অবস্থা পড়ে যাওয়াতে সে সাহায্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই আত্মীয়াই মেজমাসিমা। সেই ইস্তক এই বাড়িতেই আমার বাস, আমার গাঁই গোত্র কেউ জানে না।

আমাকে পড়ার ঘরে ডেকে পাঠানো মানেই হল, আমার কাছ থেকে কি ঘটেছে না ঘটেছে সেটুকু মেসোমশাই জানতে চান। পঞ্চমীদিদিকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যে বৃথা, সেটা তিনি খুব ভালো করেই বোঝেন। গম্ভীর মুখে বসেছিলেন, আমাকে দেখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, দেখ টুনি, তোমার মেজমাসিমা গিয়ে অবধি একটা দিনের জন্যেও মনে শান্তি পাই নি। তোমার মাসি এত অল্পে কাতর হয়ে পড়েন যে, কি যে করব বুঝে উঠতে পারি না। তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া বড় শক্ত। কিন্তু সুখী না হলেও একটু শান্তিতে থাকতে চাওয়াটা কিছু তাঁর অন্যায় নয়, অথচ সেইটেই হয় না। কেন হয় না ? কি ব্যাপার খুলে বল তো ?

যা যা জানি খুলে বললাম। হয়তো সবই মনগড়া কথা, তবে পঞ্চমীদিদি যে আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভয়ে থাকে সেটা ঠিক। ওর হয়তো মানসিক চিকিৎসার দরকার। শুনে মেসোমশাই খুব খানিকটা হাসলেন। বললেন—'কয়েক বছর আগে ওর ধারণা হয়েছিল যে, ওর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে ওকে চুরি করে নেবার জন্যে দলে দলে দুষ্টু লোকেরা ঘুরছে। সেবার তো তোমার মাসির সঙ্গে গোপালপুর গেল, সমুদ্রে স্নান করে সব সেরে গেল। এবার কি করা যায় বল দিকি নি? তোমার মাসি তো বিগড়ে গেছেন, বলছেন ওকে আর রাখা নয়।

শিউরে উঠলাম শুনে। রাখা নয় মানে? পঞ্চমীদিদি তাহলে যাবে কোথায়? মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর দেখছি কপালটাই মন্দ, উদয়াস্ত খেটেও কারো মন পায় না, এমনি দুর্ভাগা। আমার মুখের ভাব দেখে মেসোমশাই কি বুঝলেন জানি না, মনের কথা খোলাখুলি প্রকাশ করা আদৌ তাঁর স্বভাব নয়, তবু যেন একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন—'আহা, এক্ষুণি তাকে বিদেয় করে দেওয়া হচ্ছে না, দিলে তোমার মাসিই পড়বেন বিপদে। তুমি দিনরাত বই নিয়ে থাক, তোমার কাছ থেকে তো আর কিছু আশা করতে পারবেন না। তবে পঞ্চমীকে একটু সামলে চলতে বল। তোমার মাসির স্নায়ুর দুর্বলতা, কথায় কথায় এত গোলমাল তাঁর সহ্য হয় না। পঞ্চমীকে সাবধান করে দেবার জন্যই তোমাকে ডাকা।'

কথাটা শুনে একটু হাসিও পেল, বেশির ভাগ গোলমালের যিনি মালিক, তাঁর গোলমাল সয় না, এ তো ভারি মজার কথা। অবিশ্যি মেসোমশাইকে সে কথা বলার আমার সাহসই ছিল না। শুধু বললাম—'তবে কি আপনিও মনে করেন—পঞ্চমীদিদি সবটাই কল্পনা করে নেয়, আসলে কিছু নয়?'

আকাশ থেকে যেন পড়লেন মেসোমশাই। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—'আমি মনে করি মানে? তুমিই তো বললে তোমার

বিশ্বাস সবই মনগড়া ভয়। ঐ মনগড়া ভয় নিয়ে যেন বাড়িতে অশান্তি করা না হয়। আচ্ছা, এখন যেতে পার।'

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল, প্রায় সারা জীবন এখানে কাটালাম, তবু আজ পর্যন্ত মেসোমশাইয়ের একেকটা কথা একেবারে অসহ্য মনে হয়। মনে মনে দিনরাত প্রার্থনা করি—পরীক্ষার ফল যেন ভালো হয়, ভগবান, কলেজের স্কলারশিপটা যেন পাই, তা হলে মিসেস মোমর্গাইয়ের হোস্টেলে সেই যে গিয়ে উঠব আর এ মুখো হব না।

নিজের কথায় নিজেরি আশ্চর্য লাগে। আর এ মুখো না হলে পঞ্চমীদিদির কি উপায়টা হবে? মেসোমশাই বলেছেন—'কেন, অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজে নেবে। এক মাসের নোটিশ দেব, কেউ বলতে পারবে না অন্যায় করে ওকে তাড়ানো হয়েছে।'

আসলে চাকরি করবার জন্যে জন্মায় নি পঞ্চমীদিদি, মুনিবয়ানা করতেই জন্মেছিল—বেচারা। কিন্তু কোথাও হিসাবের কি গণ্ডগোল হয়ে যাওয়াতে চাকরি করে খেতে হচ্ছে। আমি পাশ করে বেরিয়ে যখন নিজে চাকরি করব, তখন পঞ্চমীদিদিকে এনে কাছে রাখতে পারব, রাঁধবে বাড়বে, খাসা রাঁধে, আমার ঘর-দোর আগলাবে। আমার ঘর-দোর? কথাটা বেশ মজার, চিরকাল পরের বাড়িতে, পরের দয়াতে মানুষ হয়ে আমি নিজের ঘর-দোরের স্বপ্ন দেখি। পঞ্চমীদিদি হয়তো সে রকম স্বপ্ন দেখাও কোন কালে ছেড়ে দিয়েছে।

তবু কি দারুণ প্রাণের ভয় তার, আর শরীরের কি যত্ন! পায়ের তলায় তেল মাখছে; গরম বেনিয়ান বুনে পরছে; মাসী মেমিদের জন্যে যত টনিক আসে, লুকিয়ে সবটাতে ভাগ বসাচ্ছে। জানতে পারলে মাসি ওকে আস্ত রাখবে না!

নিজের অজান্তেই কখন নিজের শোবার ঘরে এসে পৌচেছি। দোর গোড়ায় মাসির পেয়ারের আয়া দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই

বললে —মেমসায়েব জানাতে বললেন, চিঠি, এসেছে আজ সন্ধ্যেবেলায় বুড়ো দাদামশাই এসে পৌঁছবেন। তাঁর জন্যে পুবের ঘরটা যেন ঠিক করা হয়। মেমসায়েবের তবিয়ৎ ভালো না, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না।'

আমার বিমর্ষ মুখ দেখে বোধহয় মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়েই আয়া তার মুনিবসাহেবার কাছে ফিরে গেল ব্যাস, আজ সন্ধ্যের মতো হয়ে গেল আমার পড়াশুনো! পঞ্চমীদিদিকে ধারে কাছে কোথাও দেখছি নে। ইচ্ছে হলে অদ্ভুতভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ও। মাঝে মাঝে হয়তো কোনো কারণে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে এমনি কাজের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে যে, সারাদিনের মধ্যে টিকিটি দেখতে পাই নে। সেই রাতে আমার পাশের খাটে যখন শুতে আসে তখন দেখি মুখখানি ঝড়ের মতো হয়ে রয়েছে। অবিশ্যি তখন ওকেই মান খুইয়ে মিটমাট করে নিতে হয়, নইলে রাতে কে যাবে ওর সঙ্গে কলঘরের দোর অবধি ?

ভয় পাওয়া পঞ্চমীদিদির একটা রোগবিশেষ। শোবার আগে দরজা জানলার ছিটকিনি তো পরীক্ষা করবেই, আলো ফেলে ফেলে খাটের তলা, আলমারির কোণা সব দেখবে। একা দেখতে ভয় করে তাই আমাকেও সঙ্গে থাকতে হয়। একবার চেয়ারে উঠে আমাকে আলমারির মাথা দেখতে হয়েছিল, পাছে কোনো রোগা বেঁটে চোর সেখানে চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে থাকে! এই নিয়ে আমি কিছু বললে পঞ্চমীদিদি বলে, 'এখন আমার অবস্থা দেখে কিছু বোঝার জো নেই, কিন্তু আমার বাপের বাড়ির, মামার বাড়ির আর শ্বশুর বাড়ির অবস্থা খুব মন্দ ছিল না। নেহাৎ অদৃষ্টের দোষে সব খুইয়েছি, নইলে পায়ের ওপর পা তুলে দুবেলা চোব্যচোষ্য খাওয়ার আশা করাটা খুব বেমানান হত না। চোরদের সোনার খনি ছিলাম আমরা।'

জ্ঞানচক্ষু ফোটার আগেই বাপ-মা চোখ বুঝেছেন, মামারা

দেখতে দেখতে দেউলে হয়েছেন, বিয়ে হবার পর ছ' মাসের মধ্যে সিঁদুর-নোয়াও ঘুচেছে। তারপর দেশ ভাগাভাগি বানের জলে ভেসে এসে এইখানে পঞ্চমীদিদি কূল পেয়েছে। নাকি এখনও ভালো করে খোঁজ নিলে এ কথা বেরিয়ে পড়তে পারে যে সে অনেক সম্পত্তির মালিক।

মাসির দেওয়া চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের দশহাতি থান পরে পঞ্চমী-দিদি তার পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্যের গল্প করে, তাঁদের মধ্যে কতজনা ঘাতকের গোপন আক্রমণের মরেছে তার ফিরিস্তি দেয়। হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নে। সাহস দিয়ে বলি, 'কিন্তু তোমার যখন সে ঐশ্বর্যের বালাই নেই পঞ্চমীদিদি, তোমার সে ভয়ও নেই।'

পঞ্চমীদিদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে পা দোলানো বন্ধ করে। তারপর বলে, 'কি করে জানলে নেই? না থাকবে তো আমার পেছনে লাগা কেন? তুমি নিজেই তো বল উলুবেড়ের ছ' কাঠা জমির জন্য কেউ কাউকে খুন করে না; আর তাই যদি হয় তো তোমাকে কেউ কিছু করে না কেন?'

আমি বললাম—'সব তোমার কল্পনা, তোমাকেও কেউ কিছু করে না।'

পঞ্চমীদিদি একটু চুপ করে থেকে বলল—'সব কল্পনা নয় আজ তাকে দেখেছি।'

আমি অবাক হয়ে পঞ্চমীদিদির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে বলে যেতে লাগল, 'রোগা লম্বা মিশকালো, কপালে একটা কাটার দাগ, আর সে যে কি সাংঘাতিক চোখ, খুনের চোখ, সরু চকচকে বাঁকা ঠোঁট নেই, পাৎলা একটা দাগের মতো, উঃ, কি নিষ্ঠুর। ছোট করে চুল কাটা। গলাবন্ধ একটা মেটে রঙের কোট আর আধময়লা ধুতি পরা। তার চেহারাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।'

এমন করে টিপে টিপে কথাগুলো বলতে লাগল পঞ্চমীদিদি যে

যেন লোকটাকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। গা শির শির করে করে উঠল, তবু বললাম—'আর কিছু ছিল না? লিকলিকে একটি ছুরি, কি ঐ ধরণের কিছু?'

পঞ্চমীদিদি শ্লেষ বোঝে না। বললে—'না, সে রকম দেখি নি, তবে পকেট থেকে একটা লাল পাৎলা রেশমি দড়ির মুখ ঝুলে ছিল।'

'কি করে বুঝলে পঞ্চমীদিদি, এই লোকটাই সে?' পঞ্চমীদিদি সে যে কি বিশ্রী করে হেসে উঠল, আমার গায়ে কাঁটা দিল।

'তা বুঝব না? আজ দু' মাসের ওপর হয়ে গেল আমার পাছু নিয়েছে আর আমি বুঝব না? এত কাছ থেকে দেখার আগেই ওর চেহারা আমার জানা ছিল, কথনো জামাটা দেখেছি, কথনো শরীরটাকে দূরে ছায়ায় মিলিয়ে যেতে দেখেছি, কথনো খুব কাছে ভিড়ের মধ্যে টের পেয়েছি। সরু সরু হাড় বের করা আঙুল, তার ছুঁচলো নখ।'

পঞ্চমীদিদি দু' হাতে চোখ ঢেকে খাটে বসে দুলতে লাগল। এ হিস্টিরিয়া। দিলাম কুঁজো থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ওর মাথায় মুখে ঢেলে। ও চমকে লাফিয়ে উঠে আঁচল দিয়ে মুখ গলা মাথা মুছতে লাগল। ইতিহাসের বইটা তুলে নিয়ে বললাম—'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে পঞ্চমীদিদি, এরপর মাথার গোলমাল সুরু হবে। ভালো চাও তো মেসোমশাইকে বলে ডাক্তার দেখাও। এখন আমাকে একটু পড়তে দাও।'

পঞ্চমীদিদি আর কোনো কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল। পড়ায় কিন্তু মন বসাতে পারলাম না, এ সব খেয়াল তো ভালো নয়, বিশেষ করে একজন অনাথ বিধবা, যাকে খেটে খেতে হয়, তার পক্ষে। এ কথা অবিশ্যি পঞ্চমীদিদিকে বলা চলে না। কারণ সে তখুনি তার শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের ফিরিস্তি দিতে সুরু করে দেবে। যদি বলি—'অত টাকা, তা তোমাকে নিয়ে যায় না কেন?

পঞ্চমীদিদি বলে—'তা কি আর চায় না, খুব চায়। আমার দেওর লোক পাঠায়। তার বৌ মরেছে, ছেলেপুলেদের দেখবার কেউ নেই, বারুইপুরের বিশাল বাড়ি খালি খাঁ খাঁ করে, আমাকে সেখানে গিয়ে সংসারটাকে ঠেকাতে বলে; আমিই যাই না। গেলে নাকি রাণীর হালে রাখবে।'

'কেন, যাও না কেন? বেশ তো রাণী পঞ্চমী হবে!'

'দ্যাখ, সব জিনিস নিয়ে অমন ঠাট্টা কর না। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে সাবধানের শেষ থাকে না। ও কেমন লোক কিছু জানি না, ব্যাস্ অমনি ছুট করে গেলেই হল!'

'তা মেসোমশাইকে বলে একটু খোঁজ খবর তো করতে পারো; অত অগাধ সম্পত্তির আধখানা মালিক তা হলে তুমি। এখানে চল্লিশ টাকার জন্য গোলামি করবে কেন?'

পঞ্চমীদিদি অমনি সেখান থেকে কেটে পড়ে, যাবার সময় একটু ঠেস দিয়ে বলে—'আমি তো আর তোমার মতো কলেজে পড়ি না, ও রকম করে নিজের কথা তোমার মেসোমশাইকে বলতে আমার লজ্জা করে।'

এমন মানুষের কোন কথাটা যে বিশ্বাস করব আর কোনটা যে করব না ভেবে পাই না। কোনোরকম ভালো ব্যবহার বা শিক্ষা তো আর পায় নি কখনো, সারা জীবনটাই ওর দুঃখে দুঃখে কেটেছে, স্বাভাবিক হবে কি করে? তবু আমার পড়াশুনোর সময় অতটা বিরক্ত না করলে ওর জন্যে আরো বেশি সহানুভূতি হত।

রাতে বুড়োদাদু এলে পঞ্চমীদিদি একটা সহানুভূতি করবার লোক পেল। মাসি ঘর থেকে বেরুলই না, অথচ বুড়োদাদু তারই আত্মীয়; মেসোমশায় তখনো ক্লাব থেকে ফেরেন নি; আমি ঘরটা গুছিয়ে রেখে তাঁর খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা হল দেখতে গেছি, এরই মধ্যে তিনি এসে পৌঁচেছেন আর মালা মেমিকে ঘুম পাড়িয়ে পঞ্চমীদিদিও তাঁর পায়ের কাছে কেঁদে পড়েছে। আমি কিছু

বলবার আগেই হাউমাউ করে এলোমেলোভাবে সব কথা বলা হয়ে গেছে, বুড়োদাদু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন আর পঞ্চমীদিদি ফুঁপিয়ে কান্না জুড়েছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—'ক্লান্ত মানুষটাকে একটুও কি রেহাই দিতে নেই, পঞ্চমীদিদি? না হয় খাওয়া-দাওয়ার পর আমিই বলতাম।'

পঞ্চমীদিদি মুখ তুলে ফোঁস করে উঠল—'তুমি আবার বলবে কি, তুমি তো কিছুই বিশ্বাস কর না, ভাবো আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি।'

আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম—'দাদু উঠুন, স্নানের ঘরে গরম জল দিতে বলছি, হাতমুখ ধুয়ে আগে একটু খেয়ে নিন, তারপর না হয় সব কথা শুনবেন।'

বুড়োদাদুর মুখটাকে বড় শুকনো বড় ক্লান্ত মনে হল, বয়সও তো কম হয় নি, স্ত্রী গেছেন, যত্ন করবার কেউ নেই, মেসোমশাই বলেন ছেলেটাও নাকি লক্ষ্মীছাড়া, বাপের কাছে থাকে না। আগে পয়সাকড়ি ছিল, এখন গরীব হয়ে গেছেন, তাতেই হয়তো শরীরটা ভেঙে পড়েছে, যদিও মুখে কিছুই বলেন না।

অনেক রাত অবধি কথাবার্তা হয়েছিল; পঞ্চমীদিদির চোখে ঘুম নেই, খালি বলে—'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান, আপনার সব কাজ করে দেব, আপনারো সেবাযত্ন দরকার, আমিও এখানে বাঁচব না।'

বুড়োদাদুর মুখটা দেখে কি যে দুঃখ হচ্ছিল, যেন কি দারুণ দুর্ভাবনা। দু-একবার জিজ্ঞাসা করলেন, মেসোমশাই কখন ফিরবেন, তারপর নিজেই বললেন—'তার সঙ্গে জরুরী কথা ছিল, কিন্তু ক্লাবের পার্টির পর কি তার মন মেজাজের কিছু ঠিক থাকবে?'

মন্দ বলেন নি কথাটা, তবে আজ পার্টি আছে বলে শুনি নি, বরং বাড়িতেই খাবার কথা বলে গেছেন।

বুড়োদাদু নিজের ঘরেই অপেক্ষা করতে চাইলেন, যদি দেখা হয়। নইলে কাল সকালে দেখা করেই চলে যেতে হবে বললেন। শেষটা যে কথা কখনো বলি না, তাই বলে বসলাম।

'দাদু, আর একা একা থাকবেন না। ছেলের কাছে যান।'

দাদু মাথা নাড়লেন, 'না রে, তার ঘুরে বেড়ানোর চাকরি। আমার জন্যে ভাবিস না, নিজের শরীরের যত্ন কর। রোগা দেখছি কেন? পরীক্ষার জন্যে বড্ড ভাবিস বুঝি?'

ব্যস, ঐটুকু, তাতেই আমার চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল, গলার কাছটায় টন টন করতে লাগল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দেখি, এইটুকু সময়ের মধ্যেই পঞ্চমীদিদি শুয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর ছোট আলোটা জ্বলছে, আয়নার সামনেটা অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে যেই না বড় আলোর সুইচ টিপেছি, ঘর আলো হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে পুরোনো কড়িকাঠের পাশ থেকে কি একটা কালো জিনিষ মাটিতে পড়েই কুলোপানা চক্কর ধরে মাথা উঁচু করল।

সুইচ থেকে তখনো হাত নামাই নি, ফণাধরা গোখরো সাপটার দিকে চেয়ে মনকে বারবার বলছি, ও কিছু নয়, টালি খসার মতো পুরোনো বাড়িতে এও হয়। তবু হাত-পা কেমন অবশ হিম হয়ে যেতে লাগল, বুঝলাম, শুধু পঞ্চমীদিদির কেন, আমার নিজেরো কত প্রাণের মায়া। উনুনে চাপানো কেটলির নল থেকে যেমন একটা আস্তে স্-স্-স্ শব্দ হয়, সাপটার মুখ থেকেও সেই রকম হচ্ছিল। শব্দটা পঞ্চমীদিদির কানেও গেল। আস্তে আস্তে মুখের চাদর নামিয়ে। একবারটি তাকিয়েই সে এমনি বিকট একটা চিৎকার দিল যে, এতকাল পরেও যেন মাঝে মাঝে সেটা কানে বাজে।

মিনিট দুই পঞ্চমীদিদি খাটে বসে সমানে চ্যাঁচাতে লাগল আর

আমি সাপের চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চ্যাঁচানি শুনে বুড়োদাদু আর লছমি ছুটে এল, কিন্তু তারা ঘর অবধি পৌঁছবার আগেই, ঠিক যেন তাদের পায়ের শব্দ পেয়েই সাপটা মাথা নামিয়ে নিয়ে, সরসর করে ঘর থেকে জল বেরুবার পুরোনো নালাটার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। পরে হাঁকডাক করে যখন মালী খানসামা দরওয়ান সব এসে জড়ো হল, সাপটাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না, নালার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে বিস্তর খোঁচাখুঁচি করেও না।

এর মধ্যে মেসোমশাই এসে পড়ে আমাদের ভয় দেখে হেসে লুটোপুটি। পঞ্চমীর রোগটা দেখছি বড্ড ছোঁয়াচে, টুনি, নইলে তোমার মতো একটা বুদ্ধিমতী মেয়েও সাপ দেখতে আরম্ভ করে।'

আমি বললাম—'সাপ তো আর আমি একা দেখি নি মেসো-মশাই, পঞ্চমীদিদিও দেখেছে।'

গোলমাল শুনে কখন মাসি তার রোগশয্যা ছেড়ে এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েছে, আমি টের পাই নি। এবার সে কাষ্ঠ হেসে বললে—'তা দেখবে না? সুঁড়ির সাক্ষী যে মাতাল!' তারপর বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল—'সত্যি যদি সাপ ছিল তো তাকে পাওয়া গেল না কেন?'

এতগুলো লোকের সামনে আমি কি তাহলে মিথ্যাবাদী প্রমাণ হয়ে যাব? মরীয়া হয়ে পঞ্চমীদিদির দিকে তাকালাম, সে চাদর জড়িয়ে খাটের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে, দুহাতে মুখ ঢেকে সমানে দুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমার কথা সমর্থন করবার ক্ষমতা যে তার নেই সেটুকু বুঝলাম।

কেউ একটি কথা বলল না, ঝি চাকররাও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। মাসি লছমির সঙ্গে চলে গেলে মেসোমশাই বুড়োদাদুকে নিয়ে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকলেন। সেখান থেকে অনেক রাত অবধি তাঁদের তর্কাতর্কির শব্দ কানে আসতে লাগল। আজ যেন দুপক্ষেরই মেজাজ গরম।

পঞ্চমীদিদি একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর তাকের ওপর থেকে একরাশি পুরোনো কাগজপত্র পাড়ল, তারপর সেগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে জল বেরুবার নালার মুখ বন্ধ করল। দেয়াল-আলমারী খুলে মশারি বের করে তুজনার খাটে টাঙাল, চার দিকটা ভালো করে গুঁজল। এ সমস্ত কাজেই আমি নিঃশব্দে ওকে সাহায্য করলাম। শেষে স্বাভাবিক গলায় সে বললে, 'কাল ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড এনে, ন্যাকড়া করে তুজনার খাটের পায়ে জড়াব।'

আমি বললাম—'ছেলেপুলের বাড়িতে কার্বলিক আনাটা কি ঠিক হবে?'

পঞ্চমীদিদির চোখতুটি অস্বাভাবিক রকমে জ্বলে উঠল। সে বললে—'নিজের প্রাণের বড় আর কিছু নেই।' আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—'ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর বড়দাদা পুলিশে কাজ করতেন, এখন পেনসান নিয়ে টিকটিকি হয়েছেন। কাল একবার যেতেই হবে ওঁদের ওখানে।'

সারারাত ঘরে আলো জ্বলল, মশারির চার ধার ভালো করে গুঁজে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম পরদিন সকালে নিজেরি ভেবে আশ্চর্য লাগছিল। এতদিন পঞ্চমীদিদির ভয় নিয়ে ঠাট্টা করেছি, কাল রাত থেকে মনের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। আর শুধু তাই নয়, ওর সঙ্গী হওয়াটাও যে বিপজ্জনক তাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এমন একটা অসহায়া অপ্রিয়া অভাগীকে ছাড়িই বা কি করে? নইলে আমার নিজের জন্যে সে রকম সমস্যা ছিল না; হস্টেলে এখুনি জায়গা পেতে পারি, তাও কারো দয়ার জন্যে নয়। কলেজের পাশেই মিশন স্কুলের হস্টেল, সেখানে রোজ সন্ধ্যেবেলায় সাড়ে ছটা থেকে আটটা অবধি মেয়েদের পড়া তৈরিতে সাহায্য করলেই মিসেস মোমর্গাই আমাকে আদর করে নিয়ে নেবেন। ঐ সময়টুকু না হয় না-ই পড়লাম, এখানেও তো হরদম

পড়ার ব্যাঘাত হয়। বরং হস্টেলে বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে পড়া যেত। কিন্তু এ বিষয় পঞ্চমীদিদিকে কিছু বলাও যাবে না, সে অমনি রাগে দুঃখে একটা কাণ্ড বাধাবে।

সে রাতে যে দুজনের মধ্যে কারো খুব গভীর ঘুম হয়েছিল তা মনে হয় না। পঞ্চমীদিদির বিছানা মাসি শঙ্করকে দিয়ে এঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে এর আগে যথেষ্ট কান্নাকাটি হয়ে গেছে, এখন আর বেচারার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। কখনো যদি নিজের কথা মনে করে দুঃখ হয়, অমনি আমি পঞ্চমীদিদির কথা ভাবি, তখুনি নিজের দুঃখগুলোকে তুচ্ছ মনে হয়।

সকালে উঠেই হাতমুখ ধুয়ে বুড়োদাদুর ঘরে গেলাম। ঘর ভোঁ-ভাঁ, পুরোনো চামড়ার সুটকেসটা আর ছোট্ট বেডিংটি নিয়ে কোন ভোরে তিনি চলে গেছেন। হয়তো কাল রাতে মেসোমশায়ের সঙ্গে কিছু খিটিমিটি বেধে থাকবে, যার জন্যে এত সকালেই বিদায় নিয়েছেন। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। ঐ একটা লোকই আমার আপনার ছিল।

আরেকটু বেলা পড়লে মাসির মা'র মস্ত পুরোনো গাড়িটা এসে মাসি, সুকু, মালা আর মোমিকে নিয়ে গেল। দিদিমা নাকি বলেছেন মাসির কিঞ্চিৎ যত্ন ও শাসন দরকার, অন্তত লছমির কথা থেকে তাই বুঝলাম। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের স্কুলে হামের প্রকোপ, তাই তিন সপ্তাহ আগেই পূজোর ছুটি দিয়ে দিয়েছে। লছমিকে দিদিমা দু চক্ষে দেখতে পারেন না, তাই তার যাওয়া হল না ; এই তো সবে এক মাসের ছুটি করে এসেছে তাই আর ছুটিও পেল না। নাকি বাবুর্চির বৌয়ের অসুখ, সে দেশে যাবে, লছমি রাঁধবে।

সত্যি কথা বলতে কি লছমি রাঁধে ভালো, এই একটা মাস খাওয়া-দাওয়া বরং আরো ভালো হবে, তবু মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে এই বিরাট বাড়িতে শুধু পঞ্চমীদিদি, আমি, আর লছমি রইলাম ; মেসোমশাই এত কম সময় বাড়িতে থাকেন যে, সে

না থাকারই মধ্যে; হারু খানসামাটা মেসোমশাই বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় আর তিনি ফেরার আধঘণ্টা আগে আবার দেখা দেয়। থাকে পাশের গলিতে একটা গুদোমে, সেখানে নাকি তার পরমাসুন্দরী বৌ আছে।

এ ছাড়া অবিশ্যি মালী, ড্রাইভার, দরওয়ান, ঝাড়ুদার আছে, তবে তারা কেউ রাতে এ বাড়িতে থাকে না। এমন কি দরওয়ানকে ডাক দিলেও সে শুনতে পাবে কি না সন্দেহ, কারণ এ বাড়িটা বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত। এর সদর ফটক অনেকটা দূরে, সেইখানে দরওয়ানের ঘর, তারপর দশ ফুট চওড়া একশো ফুট লম্বা লাল কাঁকর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে তবে বাড়ির সামনেকার ফালি বাগানে পৌঁছনো যায়। সেখানে একসারি সাবুগাছের গোড়ায় গোছা গোছা মেডন্ হেয়ার ফার্ন হয়ে আছে; গাড়িগুলো বাইরে থেকে এসে গাড়িবারান্দার নিচে ঢোকে, আবার ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে ছোট্ট বাগানটিকে ঘুরে আবার সেই গলি দিয়েই বেরিয়ে যায়। সে পথে দুটি গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না, তাই দরওয়ান বড় রাস্তার ওপরে গলির মুখ আগলায়।

আমাদের যাওয়া-আসা কিন্তু এর ঠিক উল্টোপথে চলে, অর্থাৎ খিড়কি দিয়ে। বাড়ির পিছনেই একটা গলি, আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে সেই গলিটাকেই দেখা যায়, সদরের সঙ্গে আমাদের খুব বেশি যোগাযোগ নেই।

মাসিরা চলে গেলে জানলা দিয়ে দেখি পঞ্চমাদিদি খিড়কিদোরের খিলটাকে পরীক্ষা করছে। দেখে আজ কিন্তু খুব বেশি হাসি পেল না। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খিড়কিদোরের ঠিক উল্টোদিকে ওপারের ফুটপাথে একটা লম্বা-চওড়া লোক দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের মতোই চেহারা, মুখটা দেখতে ভালোই বলতে হবে, মাথাভরা এক রাশ কোঁকড়া চুল, ফর্সা রং, কাটা কাটা নাকমুখ, গুরুগম্ভীর হাবভাব। কেন যে তাকে অতটা খুঁটিয়ে দেখলাম ভেবে পেলাম না। পরনে

সাদা সাধারণ ধুতী-পাঞ্জাবী, মুখে একটা সিগারেট। শুধু একটাই বা বলি কেন, আমার চোখের সামনে সেটাকে ফেলে দিয়ে আবার একটা ধরিয়ে আস্তে আস্তে ফুটপাথে পাইচারি করতে লাগল। ভাবখানা যেন কত গভীর চিন্তায় মগ্ন, কিন্তু চোখ দুটো যে আসলে এ বাড়ির ওপরেই রয়েছে সে আর বলে দিতে হল না।

পঞ্চমীদিদি যে কখন খিড়কি-পরীক্ষা সেরে ওপরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। হঠাৎ সে বলে উঠল—'ঐ, ছাখ, ডানদিকের পকেট ঝুলে রয়েছে, ওতে ওর নকল ডাস্টার আছে, এক নিমেষে হাতে গলিয়ে একটি ঘুঁষি লাগালেই নাক চোখ মুখ সব একাকার হয়ে যাবে।

আমি না বলে পারলাম না,—'পঞ্চমীদিদি, এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি। ভদ্রলোক হয়তো কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে।'

পঞ্চমীদিদি বললে—'হুঁ, অপেক্ষা করছে সন্দেহ নেই, এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে যে সিগারেট ফেলে ফেলে ফুটপাথটাকে সাদা করে ফেলেছে।'

চেয়ে দেখি বাস্তবিকই তাই, বলি—'বাঃ, তুমি নিজেও দেখি টিকটিকি হয়ে উঠেছ। আর ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কি হবে?'

একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পঞ্চমীদিদি বললে, 'না টুনি, সব কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাল রাতের ব্যাপারের পর, আশা করি তুমিও সে কথা বুঝেছ? এতকাল এ বাড়িতে বাস করেছ, এর আগে সাপ দেখেছ কখনো? তায় অত বড় গোখরো সাপ। কিন্তু এও আমি বলে রাখছি, এরা যতই আমার প্রাণটা নেবার চেষ্টা করবে, আমিও ততই প্রাণটার জন্যে লড়ব।'

জানলা ছেড়ে আবার খাটে বসে পড়ল পঞ্চমীদিদি, বেঁটে বেঁটে পা দুটো মাটি থেকে দু বিঘৎ ওপরে ঝুলতে লাগল। বিষণ্নমুখে বলল—'বাইরের বিপদ যদি বা এড়ানো যায়, ঘরের মধ্যে বিপদ থাকলে ঠেকাবে কি করে?'

'কি যে বল, পঞ্চমীদিদি, ঘরের মধ্যে বিপদ আবার কোথায় দেখলে ?'

একটু চুপ করে থেকে পঞ্চমীদিদি ঠোঁট চিপে বললে—'বুড়োদাদুর কথাটা ভেবেছ কখনো ?'

'বুড়োদাদুর কথাটা ? সে আবার কি ?' হঠাৎ কি রকম উত্তেজনা বোধ করতে লাগলাম। রুক্ষস্বরে বললাম,—'কি বলতে চাইছ তুমি, পঞ্চমীদিদি ? তুমি কি তাঁকে সন্দেহ কর নাকি ? তাঁর কাছ থেকে তো কম উপকার পাই নি আমরা।'

পঞ্চমীদিদি পা দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে বসল। 'তা তুমি বলতে পার, একরকম বলতে গেলে তাঁর জন্যই তোমার প্রাণটা বেঁচেছিল। কিন্তু আমার কথা আলাদা।'

'কি আবার আলাদা ? তোমাকে সরিয়ে ওঁর লাভ ?'

'আরে, অত রেগে যাচ্ছ কেন ? তোমার মেসোমশাই ঠিকই বলেছিলেন দেখছি।'

'কি ঠিকই বলেছিলেন মেসোমশাই ? অত হেঁয়ালি না করে খুলে বলতেই তো পার।'

'বেশ তাই বলছি, আবার আমার ওপর চটে যেও না যেন। মেসোমশাই বলছিলেন যে হঠাৎ অবস্থা খারাপ হলে মানুষের মাথার কিন্তু ঠিক থাকে না। এককালে বুড়োদাদুর অগাধ সম্পত্তি ছিল, নিজের দোষেই সব খুইয়েছেন, এতে তাঁর মাথার ঠিক নাও থাকতে পারে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে বুড়োদাদু তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করছেন। আর হাসিও না, পঞ্চমীদিদি। কাল তো দেখলাম পায়ে পড়ে খুব খানিকটা কেঁদে নিলে !'

পঞ্চমীদিদি উঠে পড়ে ঘরদোর ঝাড়তে মুছতে লাগল, অন্যান্য ঘর শঙ্কর ঝাড়ে মোছে, এ ঘরটা ঝাড়তে মাসি বারণ করে দিয়েছে, কাজেই শুধু মুছে দিয়ে যায়। আমার তখন মাথাটা একটু গরম

হয়ে উঠেছিল, তাই প্রসঙ্গটাকে ঐখানে থেমে যেতে দিলাম না। রাগতভাবে বললাম,—'তোমরা কি পাগল হয়েছ, পঞ্চমীদিদি? নিকট আত্মীয়, এত ভালো লোক, চিরকাল সমাজসেবার জন্যে নিজের পয়সা-কড়ি দু হাতে খরচ করেছেন, এখনি না হয় দুরবস্থায় পড়েছেন। এই সেদিনও আমাদের দু কাঠা করে জমি দান করেছেন—'

পঞ্চমীদিদি বাধা দিয়ে বলল—'সেই কথাই বললেন মেসোমশাই। ঐ জমি দানের নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে, এমনি এমনি উলুবেড়েতে কেউ জমি দেয় নাকি? আমরা কিন্তু সেখানে বাস করতে যাচ্ছি না।'

প্রাচীন ইতিহাসের বইতে আর মন বসছিল না, বই বন্ধ করে বললাম—'কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটা বল।'

হতাশভাবে পঞ্চমীদিদি বললে—'তাই যদি জানতাম, তাহলে তো বিপদ কেটে যেত। নাঃ, তোমাকে কিছু বলাটাই ভুল হয়ে গেছে, মেসোমশাই মানা করেছিলেন। তবে, বাজুর মার কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?'

সত্যি বাজুর মার কথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নি। লছমির আগে বাজুর মা মাসির কাজ করত, মাসির বিয়ে হয়ে অবধি সে এ বাড়িতে বাস করত, আমার প্রায় সারা শৈশবটাকে সে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছিল। মানুষটা কিন্তু ভারি সৎ ছিল, একটা পয়সায় হাত দিত না, মাসি ওর কাছে সিন্দুকের চাবি রাখত। আমার দিকে দয়া-মায়া না থাকলেও মাসিকে দিনরাত আগলে রাখত। হয়তো নিছক অনাত্মীয় বাইরের লোক হয়ে চারবেলা এ বাড়িতে খাচ্ছি দাচ্ছি পয়সা খরচ করাচ্ছি বলেই, তার আমার ওপর রাগ ছিল। মোট কথা তার জন্যে ছোটবেলায় কত যে অপদস্থ অপমান হয়েছি, লুকিয়ে কত যে কেঁদেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু মানুষটা যে সৎ ছিল এটা আমাকেও মানতে হত।

সেই বাজুর মা'র ছেলে বাজু বড় হয়ে কুসঙ্গে পড়ে গোল্লায় গেল,

তখন তার খরচের টাকা মা ছাড়া আর কে জোগাবে? দিনে দিনে বাজুর মার পরিবর্তন হতে লাগল। তার জ্বালায় পয়সাকড়ি থেকে আরম্ভ করে, কাপড়-চোপড়, বই, কলম কিছু আর বাইরে রাখার জো রইল না।

প্রথমটা শুধু আমার জিনিষ নিত, মাসি বিশ্বাস করত না, টিটকিরি দিত, বলত, 'নেই-লোকদের দেখি খুব দানের হাত হয়েছে!' তারপর যখন মাসির জিনিষ নেওয়া ধরল, মায় মাসির ড্রেসিং টেবিলের টানা থেকে সোনার হাতঘড়ি পর্যন্ত, তখন তাকে বিদায় করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

পঞ্চমীদিদির কথায় হঠাৎ এত কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু বুড়োদাদুকে সন্দেহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ছোটবেলায় তাঁর এ বাড়িতে আসার দিনগুলি আমার মনের ক্যালেণ্ডারে লাল অক্ষরে লেখা থাকত। টুকিটাকি এটা ওটা আমার জন্যে নিয়ে আসতেন, সেগুলি আমি যত্ন করে তুলে রাখতাম, আজ পর্যন্ত আমার টিনের ট্রাঙ্কের সব চেয়ে তলায় রঙিন রুমালে জড়ানো তার কতক কতক রাখা আছে। সে কথা মনে করে ঢোক গিলতে গিয়ে গলায় ব্যাথা লাগল।

পঞ্চমীদিদি অদ্ভুত একটা চাপা উল্লাসের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে ছিল, আমি গাঢ়স্বরে বললাম—'একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।' এই বলে বইটা খুললাম।

পঞ্চমীদিদি উঠে পড়ে বলল— 'কেন, বিশ্বাস না করার কি আছে? ওঁরও তো শুনেছি উড়নচণ্ডে একটি ছেলে আছে। পয়সা-কড়ি নেই তার খরচ জোগাবে কে।'

রেগে বললাম,—'তুমি বলে কি তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক হবেন নাকি?'

একটু হাসল পঞ্চমীদিদি, 'হতেও পারেন, ওঁকেই তো সর্বস্ব উইল করে দিয়েছি।'

'কি সর্বস্ব ? ভাঙা ট্রাঙ্কে কয়েকটা পুরানো কাপড়-চোপড়, ওঁরই দেওয়া একটা সোনার হার আর ওঁরই দেওয়া দু কাঠা জমি, এই তো ?'

এবার পঞ্চমীদিদিও রেগে গেল। উঠে পড়ে বলল—'দেখ, যাদের তিনকুলে কেউ নেই, একটা মুখবাঁধা ছালায় যাদের খুঁজে পাওয়া গেছল, তাদের মুখে এত কথা শোভা পায় না। তাছাড়া কতবার বলেছি না তোমাকে বারুইপুরে আমার শ্বশুরের অনেক সম্পত্তি ছিল, তার অর্ধেকের মালিক আমি। না হয় দেয় নি কিছু, কিন্তু সেখানে গিয়ে তার ঘর দোরের দেখাশুনো করতে দেওর কতবার বলে পাঠিয়েছে তা তো তোমাকে বলেছি। তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কি করতে পারি।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না দেখে পঞ্চমীদিদি উঠে পড়ে আবার জানালার ধারে গেল। 'ইস, দেখেছ, ও লোকটা গেছে, তার জায়গায় একটা গাঁট্টাগোট্টা পাহাড়ি লোক ডিউটি দিচ্ছে ! এরা যদি তোমার পেয়ারের বুড়োদাদুর চর না হয় তো কি বলেছি।'

বিকালের মিষ্টি রোদটা কি কমে গেল ?

সেদিন মেসোমশাই আটটা বাজতেই বাড়ি ফিরলেন। মুখখানি দেখলাম অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর এবং ক্লান্ত। খেয়ে উঠেই আমাদের দু'জনকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে বললেন— 'তোমাদের একটি বিষয়ে সাবধান করে দিতে ডেকেছি। বাড়িতে এখন তোমাদের মাসিমা নেই, আমিও বাইরে বাইরে থাকি, কোনো বাইরের লোক ঢুকতে দেবে না, আর নিজেরাও কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে মিশবে না, কথা বলবে না। এর যেন ব্যতিক্রম না হয় কোনোমতে। এখন যেতে পারো।'

পঞ্চমীদিদি এমনিতেই সারাক্ষণ ভয়ে আধমরা হয়ে থাকে, মেসোমশাইয়ের কথা শুনে তো হাত-পা গিয়ে পেটে সেঁদিয়েছে। ঘরে ফিরেই আমাকে বলল, 'এ আমি জানতাম।'

'কী আবার জানতে ?'

'এমনি হবে জানতাম। বেড়াজালে মাছ ধরা দেখেছ কখনো ? জাল যখন বড় থাকে মাছেরা দিব্যি খেলে বেড়ায়, বিপদের কথা টেরও পায় না। ক্রমে জালের মুখ ছোট হয়ে আসে আর মাছেরাও বুঝতে পারে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু তখন আর পালাবার উপায় থাকে না। শেষে একদিন—'

কথা বন্ধ করে পঞ্চমীদিদি দেখি ইসারা করে জানলা দিয়ে কাকে যেন সরে যেতে বলছে। আমি উঠে জানলার কাছে যেতেই পর্দা টেনে দিয়ে কর্কশস্বরে সে বললে—'কি ? কি দেখছ ?'

'ও লোকটা কে, যাকে তুমি সরে যেতে বললে ?'

তেড়িয়া হয়ে উঠল পঞ্চমীদিদি। 'কাকে আবার সরে যেতে বলব ? তুমি কি পাগল হলে নাকি, টুনি ?'

আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। স্পষ্ট দেখলাম আধাবয়সী রোগা ডিগডিগে একটা লোক আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে গ্যাস লাইটের তলা থেকে সরে গেল। ফিরে কঠিন গলায় বললাম, 'তোমাকে আমি বুঝে উঠি নে। এমনিতেই ভয়ে নাড়ী ছাড়বার জোগাড়, তার ওপর মেসোমশাই এত করে সাবধান করে দিলেন, আর পাঁচ মিনিট না যেতেই অমনি বাইরের অচেনা লোককে ইসারা করছ। কে ও লোকটা ?'

পঞ্চমীদিদিও অমনি মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল,—'মেরে ফেলবে, ফেল। তাড়াবে তাড়াও। তাই বলে ভদ্রলোকের ঘরের বিধবার নামে ও কথা ব'ল না।'

আমি তবু বললাম—'নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা যায় না। বল ও কে, নইলে এই চললাম মেসোমশায়ের কাছে।'

একলাফে পঞ্চমীদিদি আমার পা দু'টোকে জড়িয়ে ধরল—'না, না, না, বলছি, সব বলছি, মেসোমশায়ের কাছে যেও না।'

ঠিক এমনি সময় কোনো শব্দ না করে লছমি এসে ঘরে ঢুকে

বলল—'দিদিরা আজ খাবেন না নাকি? সাহেবের বাসন তুলে দিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব?'

ব্যস, কথাটা তখনকার মতো চাপা পড়ে গেল। খাবার পর মাথাধরার অছিলা করে পঞ্চমীদিদি চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আমি একবার জানলার কাছে গিয়ে দেখি সকালের সেই দেখতে ভালো লোকটি আবার সিগারেট হাতে ও-ফুটপাথে পাইচারি করছে। নিজের বিছানার ওপর বসে গম্ভীর গলায় বললাম—'পঞ্চমীদিদি, ওরকম কর না, তাহলে তুমিও বাঁচবে না আমাকেও বাঁচতে দেবে না। ও-ফুটপাথে আবার পাহারা বসেছে দেখছি। সে লোকটি কে, যাকে তুমি সরে যেতে বললে?'

আস্তে আস্তে মুখ থেকে চাদর নামিয়ে পঞ্চমীদিদি বললে, 'আমার বারুইপুরের দেওর।'

চমকে উঠলাম। বারুইপুরের দেওর? সে আবার কে? কি চায় সে? মুখে বললাম—'বাজে কথা ব'ল না, পঞ্চমীদিদি, তুমি নিজের মুখেই বলেছ অনেক সম্পত্তির মালিক সে, মস্তবড় কোঠাবাড়ি আছে তোমার শ্বশুরের, রাণীর হালে রাখতে চায় তোমাকে। এ লোকটা তো একটা—একটা পাড়াগাঁর মুদির মতো দেখতে।'

পঞ্চমীদিদি বললে—'পাড়াগাঁর লোকরা সাজ-পোশাকের অত জানে কি? তোমাকেও তো শুনেছি ছালার ভেতর থেকে যখন বের করা হয়েছিল, পরণে একটা ট্যানাও ছিল না।'

এর কোনো উত্তর হয় না। একটু হেসে বললাম, 'জন্মেও ছিলাম ঐ বেশেই। কিন্তু ঠাট্টা নয়, কে তোমাকে বলেছে যে লোকটা সত্যি তোমার দেওর! তুমি চেনো তাকে?'

হাঁড়িমুখো পঞ্চমীদিদি বললে, 'মুখ চেনা না হতে পারে, কিন্তু তার ঠিকুজি দেখেছি। আর শুধু তার কেন আমার শ্বশুরমশায়ের ঠিকুজিও দেখেছি।'

পঞ্চমীদিদির মুখে সম্পর্কগুলো অদ্ভুত শোনাল। বললাম, 'হ্যাঁ!

ঠিকুজি না আরো কিছু? সব জাল, এ কথা তোমাকে বলে রাখলাম। খবরদার বাড়ি থেকে বেরুবে না; এখনো কি তোমার শিক্ষা হয় নি?'

সটাং উঠে বসল পঞ্চমীদিদি—'বাড়িতেই না আমাকে কত নিরাপদে রেখেছে। আজ চিলছাদের সিঁড়িতে টন্ সুতো বাঁধা, কাল ছাদ থেকে মাথার ওপর টালি খসে পড়ছে, তার পরদিন ঘরে কেউটে সাপ ফণা ধরছে। বারুইপুরে নিজের স্বামীর ভিটেয় এর চাইতে শতগুণে নিরাপদে থাকব।'

শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল; অচেনা লোকটার সঙ্গে সরাসরি বারুইপুর রওনা দেওয়া ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে, পঞ্চমীদিদি ঘোলাটে চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলে যেতে লাগল, একরকম জমিদারই বলতে গেলে আমরা এখানকার; বিরাশী বিঘে ধানজমি; চারটে বড় বড় পুকুর, তাতে মাছ কিল-বিল কচ্ছে; বাঁশঝাড় নারকেল গাছ অগুণতি; কাঁঠাল কাঠের হাতে কোঁদা আসবাবে আর সিন্দুক-বোঝাই এই ভারি ভারি থাগড়াই কাঁসার বাসনে বাড়ি একেবারে ঠাসা। অন্দরে সান-বাঁধানো পুকুরপাড়ে শ্বেতপাথরের মন্দিরে জনার্দন আছেন, রোজ তাঁকে ভোগ দিতে হয়, তাই কে রেঁধে দেয় তার ঠিক নেই। ঠাকুরপোর সত্যিই কাপড়ের দোকান আছে, তার হাতে সময় থাকে না, বিশ্বাসী লোকও পাওয়া যায় না, যার হাতে অত রূপোর বাসন, সোনার গয়না ছেড়ে দেওয়া যায়। ওখানে না যাওয়াটাই আমার অন্যায় হবে। একটা মেয়েমানুষ নেই বাড়িতে, দেওরের ছেলেটাও দোকানে বসে, তার ওপর বড় ননদ কবে গত হয়েছেন, তাঁর অনাথা নাত্‌নীটাও এসেছে, ছ্যাঁকা-পোড়া খেয়ে শরীর থাকছে না তার।

শেষটা যখন থামল পঞ্চমীদিদি, তার ঘোলা চোখ চক্‌চক্

করছে। আমিও গা-ঝাড়া দিয়ে যেন কোন রূপকথার দেশ থেকে নেমে এলাম।

'এ সব কি সত্যি তুমি বিশ্বাস কর পঞ্চমীদিদি? আমার মুখের কথায় যদি কাজ না হয় তো গুরুজনদের বলতে হবে।'

পঞ্চমীদিদি সত্যি সত্যি খিলখিল করে হেসে উঠল।

'গুরুজন? গুরুজন মানে মেসোমশাই নিশ্চয়? বেশ তো বল না গিয়ে তাঁকে। আমিও কি চুপ করে থাকব ভেবেছ নাকি? এক্ষুণি টেনে এনে বুড়োদাদুর গুণধর পুত্রের টহল দেওয়া বার করে দেব না!'

এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে আর কি বলব। পঞ্চমীদিদি বলে যেতে লাগল—'কি, অত অবাক হচ্ছ কেন? ও ফুটপাথের ঐ কার্তিকটি বুড়োদাদুর ছেলে তা কি তুমি বোঝ নি?' তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে আরো বলল, 'ও হো, তাই তো তুমি যে তাকে চোখেও দেখনি, তুমি যখন ইস্কুল-কলেজে, সেই সময়ে এখানে ওর যাওয়া আসা—'

রেগে বললাম, 'কেন? আমার সামনে দিয়ে আসতে কোন বাধা আছে নাকি?'

'বিলক্ষণ আছে। মেসোমশাই জানতে পারলে আর ওর পিঠের চামড়া আস্ত রাখবেন না। এমনিতেই বেশ নজর পড়েছে তোমার চাঁদমুখের ওপর, বাপকে দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করিয়েছিল মনে নেই! কম শয়তান ভেবেছ নাকি? অবিশ্যি বিয়ের সম্বন্ধটা ওর বাপের কেরামতিও হতে পারে। অন্তত মেসোমশাইয়ের তো সেই রকম বিশ্বাস।' দম নেবার জন্যে থামল পঞ্চমীদিদি।

দাঁড়িয়েছিলাম, পায়ে কেমন জোর পাচ্ছিলাম না। বসে জিজ্ঞাসা করলাম—'আমার মতো একটা ছাদায়-খুঁজে-পাওয়া মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োদাদুর লাভ?'

দুলে-দুলে হাসতে লাগল পঞ্চমীদিদি। মেসোমশাইয়ের ঘাড়

থেকে একটা বোঝা নামিয়ে তাঁকে একটু খুশি করা, এই লাভ। বুড়োদাহুর সর্বস্ব মেসোমশায়ের কাছে বাঁধা দেওয়া, তার ওপরেও এত ধার নিয়েছেন মেসোমশায়ের কাছ থেকে যে, সারাজীবন ধরেও তা শুধতে পারবেন না। বাকি ছিল ঐ চার কাঠা অকেজো জমি, তাও মেসোমশাই আমাদের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। মজা কাকে বলে।'

পঞ্চমীদিদির কথা অবিশ্বাস করতে আমার একবারও মনে হল না। মেসোমশায়ের কাছ থেকেই হয়তো ওর শোনা, নিদেন মাসি ওকে বলেছে। আমাকে একটু ছোট করতে পারলে মাসি আর কিছু চায় না। অথচ বুড়োদাহু মাসির নিজের মায়ের নিকট সম্পর্কের ভাই হন। ছোটবেলাকার অযৌক্তিক অসহ্য দুঃখে যখন আমার বুক ফেটে যেত, বুড়োদাহু মুখের মধ্যে চকোলেট পুরে দিতেন। তখন তাঁদের অবস্থা খুব ভালো, প্রকাণ্ড খোলা মোটরে চেপে এসে আমাদের সবাইকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মেজমাসিকে খুব ভালবাসতেন, পকেটে করে সর্বদা তাঁর ছেলেমেয়ে, সাগর আর সোনালির জন্যে নানারকম ছোট্ট ছোট্ট মজার খেলনা আনতেন। আমিও সমান ভাগ পেতাম। তখন আমার চার বছর বয়স ছিল, অথচ সব কথা স্পষ্ট মনে আছে, শুধু মেজমাসির মরার কথাটা মনে করতে পারি না। হয়তো বড় দুঃখের স্মৃতি বলেই ইচ্ছে করে মন থেকে ঠেলে দূর করে দিয়েছিলাম।

কবে যে মেসোমশাই মেজমাসির চেয়ে দশ বছরের ছোট এই মাসিকে বিয়ে করলেন তাও ভুলে গেছি। হয়তো আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাঝখানে এক বছরও যায় নি। নাতি-নাতনী অন্য সৎমার হাতে পড়লে পাছে কষ্ট পায় এই মনে করেই বোধ করি দিদিমা নিজে উদ্যোগী হয়ে ছোট মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। ফল হয়েছিল উল্টো, এসেই মাসি তার পাঁচ বছরের বোনপো-বোনঝিকে এমনি বিষনজরে দেখতে

শুরু করে দিল যে দিদিমা তাদের সরিয়ে নিজের কাছে কয়েক বছর রেখে একটু বড় করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিলেন। এবার তারাও সেখানে বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে, আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।

বড় কষ্টে আমার ছোটবেলাটা কেটেছে, বুড়ি ঝির বিছানায় তার গলা জড়িয়ে শুতাম। সে মলে পর থেকে আমি একা। তবে একা খুব বেশি লাগত না, তার কারণ প্রায় প্রত্যেকদিন বুড়োদাদু এসে দেখে যেতেন। এই সেদিন অবধিও এসেছেন। তারপর ব্যবসা নষ্ট হওয়াতে নিজের ধান্দায় কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান বলে গত তিন-চার বছর বড় একটা দেখা পাই না। অনেকদিন পরে কাল এসেছিলেন, এসেই আবার চলে গেলেন। হঠাৎ পঞ্চমীদিদি ডাকল—'টুনি, ঘুমিয়েছ ?'

'না কেন ?'

'বুড়োদাদুর এক কানাকড়িও নেই, উলুবেড়ের পাঁচশো বিঘাও মেসোমশায়ের হয়ে গেছে, এটা জানতে ?'

'না।'

'এখন ছেলেকে চর লাগিয়েছেন কি মৎলবে কে জানে। তুমি খুব সাবধানে থেকো।'

'আর তুমি ?'

'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে।'

হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। শেষরাত্রে এমনি ঘুমিয়ে পড়লাম যে সকাল সাতটার আগে ঘুম ভাঙল না। পঞ্চমীদিদি উঠে গেছে, নিচে তার গলার আওয়াজ পেলাম। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি ও ফুটপাথটি ফাঁকা, চারদিকে অজস্র পোড়া সিগারেট ছড়ানো।

সত্যিই কি ও বুড়োদাদুর ছেলে ? মাসি আর মেসোমশাই

অষ্টপ্রহর তার নিন্দে করেন, বুড়োদাত্থ তার নামও করেন না। কি যেন একবার শুনেছিলাম বুড়োদাত্থর স্ত্রী ছেলে কোলে নিয়ে কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আর বুড়োদাত্থর সঙ্গে দেখা হয় নি, ছেলেটাও নাকি অন্য লোকের কাছে মানুষ হচ্ছিল, তবে ষোল বছর বয়স হতে নিজে ইচ্ছে করে বাপের কাছে চলে এসেছিল। বুড়োদাত্থ তার কথা কখনো বলতেন না, আর আমি অন্তত ছেলেকে কখনো এ বাড়িতে আসতে দেখি নি।

চা খেতে যখন নিচে নামলাম পঞ্চমীদিদির অন্য চেহারা দেখলাম, হঠাৎ যেন তার মনে বড় ফূর্তি এসেছে। দেখেই তো আমার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। এত কষ্ট পেয়েছে সারাজীবন, তবু মন ওঠে নি, না জানি আরো কি নতুন দুঃখে ঝাঁপ দেবার তালে আছে। দেখলাম এই ভোরেই তেল মেখে স্নান করে পাতা কেটে চুল আঁচড়েছে, একটা ফর্সা কাপড়ও পরেছে, গায়ে পুজোর সময়ে বুড়োদাত্থর দেওয়া তসরের জামা উঠেছে। ফস্ করে বললাম, 'যাক, বুড়োদাত্থর জামাটা তবু গায়ে উঠেছে দেখছি। শুনলে তিনি—'

বাধা দিয়ে পঞ্চমীদিদি বললে—'দাত্থর সঙ্গে মেশা বারণ, অন্য লোকের কাছে দাত্থর কথা বলা বারণ। দাত্থর এ বাড়িতে আসা বারণ।'

আমি হাঁ করে পঞ্চমীদিদির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, সে চামচ দিয়ে চায়ের চিনি ঘুঁটতে ঘুঁটতে মুখ চিপে হাসতে লাগল। তারপর একবার আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে হাতের বাসি রুটিতে জ্যাম মাখাতে লাগল। পাঁউরুটি সে খায় না, এতকাল বাদেও কিছু কিছু মানামানি রয়ে গেছে তার।

আমি কোনো কথা না বলে চায়ের পেয়ালা তুললাম। পঞ্চমীদিদি বললে—'উঃ ফু! কাল মেসোমশায়ের সে কি রাগ! আমি থাকতে সব কথা বুড়োদাত্থর কানে গেল কেন? সত্যি তোমায় যদি কেউ অনিষ্ট করতে চায় তো আমি আছি ব্যবস্থা করবার। ওঃ!

আমার ব্যবস্থা করে তো উনি উল্টে দিচ্ছেন। তবে বুড়োদাদুর কথাটা মন্দ বলেন নি, ভালো চাও তো তুমিও সাবধান হও সময় থাকতে। ও কি উঠলে যে?'

আমি চেয়ার ঠেলে বসলাম—প্রথমে মিসেস্ মোমর্গাইয়ের কাছে যাব, দরকার আছে। তারপর আজ কলেজে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড আনতে হবে। দুপুরে বাড়িতে খাব না, মেয়েরা আমাদের ফেয়ারওয়েল্ দিচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া আছে।'

পঞ্চমীদিদি কোনো আপত্তি করল না, বরং যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। আমি ওকে বললাম—'দেখ পঞ্চমীদিদি, মাথায় যদি কোনো পাগলামি ঢুকে থাকে তো ঝেড়ে ফেল।'

কপালে চোখ তুলে সে বললে—'কি পাগলামি?'

'এই যেমন ধর দেওরের বাড়ি যাওয়া।'

'ইচ্ছে হলে তো অনেক আগেই যেতে পারতাম।'

'সে ইচ্ছে যখন আগেও হয় নি, এখনো যেন না হয়। না পঞ্চমীদিদি, ঠাট্টা করছি না। আমার ফিরতে আড়াইটে তিনটে হবে। সাবধানে থেকো।'

আসলে বুড়োদাদু ছাড়া কারো কথা আমি ভাবতে পাচ্ছিলাম না, নইলে পঞ্চমীদিদিকে ঘরে আটকে রাখার আরো ভালো বন্দোবস্ত করে যেতাম। অন্তত দারোয়ানকে বলে যেতে পারতাম যেন খিড়কিতে তালা দিয়ে রাখে। অবিশ্যি মেসোমশাই তখনো কাজে বেরোন নি, কাজেই তখন হুকুম দেবার মালিক তো আর আমি নই। স্নান করে জিনিষ ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, পঞ্চমীদিদি ছিল রান্নাঘরে, একবার দেখাও করে গেলাম না।

বড় বড় পুরানো বাড়ির নিজস্ব একটা জীবন থাকে একথা আমার অনেক সময় মনে হয়েছে। যারা এখন ঐ বাড়িতে বাস করে তাদের সঙ্গে সে জীবনটার কোনো যোগ না থাকলেও, হয়তো আগে যারা বাস করেছে তাদের সঙ্গে থাকে। সেদিন কলেজ

থেকে ফিরে আমার নতুন করে একথাই মনে হচ্ছিল। একটা পুরোনো বাড়ির নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর বুকের ধুকপুকি শুনতে হলে বাড়িটার বর্তমান জীবনযাত্রার ছেদ পড়া চাই, অর্থাৎ ঠিক সেই সময় বাড়িতে কেউ থাকবে না, ঘড়ি টিকটিক করবে না, উনুন জ্বলবে না, পাখা ঘুরবে না, আলো জ্বলবে না ; পোষা কোনো জন্তুজানোয়ারও থাকবে না। সেদিন ঠিক এমনি অবস্থার মধ্যেই কলেজ থেকে ফিরলাম।

একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষার প্রবেশপত্র, বিদায় সভা, নীলিমা, সুলোচনা ইত্যাদির সঙ্গে শেষ একবার প্রাণভরে গল্প তারপর তিনজনে মিলে মোড়ের মাথায় 'শুভ্রা কেবিনে' আইসক্রীম খাওয়া এইসব নিয়ে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটার আগে বাড়ি পৌঁছই নি। তখন, অন্ধকার হতে সুরু করেছে, তার কারণ সে বছর ছাত্র আন্দোলনের ফলে যথাসময়ে আমাদের পরীক্ষা হয় নি, মে মাসে না হয়ে পুজোর ঠিক পরেই তারিখ ঠিক হয়েছিল। এমনিতেই দিন ছোট হয়ে এসেছিল, তার ওপর আকাশে হঠাৎ অসময়ে ঘন কালো মেঘের আবির্ভাব হয়েছিল।

কেবিন থেকে বেরিয়েই নীলিমা সুলোচনা বাস পেয়ে গেল, আমি একা তাড়াতাড়ি হেঁটে বাকি পথটুকু পার হতে যাব, পাশের বাড়ির ঝোলাবারান্দার তলা থেকে সকালের সেই সুন্দর লোকটি টপ করে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল, কিন্তু চারদিকে লোকজন, সে আমার কি এমন অনিষ্ট করতে পারে ? তা ছাড়া সাহস করে যখন তার মুখের দিকে তাকালাম কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল তাকে। ছোট একটা নমস্কার করে সে বলল—'এই সন্ধ্যেবেলা এরকম একা একা বেরুবেন না, সময়টা খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না।'

অকারণে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, জোর করে স্বাভাবিক স্বরে বললাম—'আর দু পা গেলেই তো বাড়ি, এখানে আমার এমন কি বিপদ হতে পারে ?'

সে বললে—'বাড়িতে যদি কোনো লোক না থাকে, তা হলে সেখানেও খুব নিরাপদ না-ও হতে পারেন। লছমি দুপুরে খেয়েদেয়েই বেরিয়ে গেছে; পঞ্চমীদিদি গেছে আড়াইটায়; হারু, শঙ্কর, জলধর, মালী সবাই দল বেঁধে এইমাত্র গেছে, কাহার পাড়ায় আজ সীতাহরণ যাত্রা হচ্ছে।

অচেনা লোকের মুখে এরকম কথা শুনে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পেল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমার বুড়োদাদুর ছেলে না?'

সে বললে, 'কে বলেছে আপনাকে?'

'পঞ্চমীদিদি বলেছে, কেন তাই ন'ন আপনি?'

'আমি সত্যিই মহিম চৌধুরীর ছেলে।'

তাহলে পঞ্চমীদিদি তো ভুল বলে নি। তার বাকি কথাগুলো মন থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে বললাম—'আমাদের বাড়ির ওপর এমন দিনরাত নজর রাখার মানে কি? আপনার কি কোনো কাজকর্ম নেই?' এই বলে হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। কান্না পাচ্ছিল, বুড়োদাদু কেন এমন করলেন? চিরকাল যিনি সদাশিব তিনি আমাদের পেছনে চর লাগাবেন এ যে আমার বিশ্বাসের বাইরে। তবে কি আমাদের রক্ষা করার জন্যে ওকে পাঠিয়েছেন? চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়ে লোকটি বললে—'আমার নাম আনন্দ। বাবা কি তবে আপনাদের বাড়িতে নেই?'

তবে কি লোকটা আমার কাছ থেকে কোনো কথা বের করবার জন্যে ভণ্ডামি করছে? মনে পড়ল বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা বিষয়ে মেসোমশাই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তবু অভদ্রতা তো আর করা যায় না, বিশেষ করে বুড়োদাদুর ছেলের সঙ্গে। ও যে বুড়োদাদুরই ছেলে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, চোখে-মুখে বড় বেশি আদল, তাই প্রথম দেখেই চেনা মনে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি যদি বুড়োদাদু নিখোঁজ হয়ে গিয়ে থাকেন?

সে চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বললাম, 'তিনি কাল রাত্রে এসেছিলেন বটে, কিন্তু ভোর না হতেই আমরা কেউ উঠবার আগেই বাক্স বিছানা নিয়ে চলে গেছেন ? কেন, তিনি বাড়ি যান নি ?'

কথাটা বলতেই প্রাণটা হুহু করে উঠল। বুড়ো মানুষদের এক মিনিটের জন্যেও একা থাকা উচিত নয়। আনন্দের ওপর একটু রাগও হল, 'কেন বুড়োমানুষকে এমন একা একা ঘুরে বেড়াতে দেন ? তাঁর দেখাশুনো করাটা কি আপনার কর্তব্য নয় ? যান, দেখুন কোথায় গেলেন তিনি। আমাকে এরকম ভাবে পথে দাঁড় করাবেন না। আর দয়া করে আমার সঙ্গেও আসবেন না।'

উত্তেজনার চোটে কথাগুলো কি রকম অস্বাভাবিক রকম রূঢ়ভাবে বলে ফেললাম। তার মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে উঠল, তার পরেই ছাইয়ের মতো দেখাতে লাগল। আমি আর অপেক্ষা না করে, সোজা বাড়ি চলে গেলাম। খিড়কিতে তালা দেওয়া হত, তার দুটো চাবি, একটা আমার কাছে আর একটা পঞ্চমীদিদির কাছে থাকত। রাতে চাকর-বাকররা বাইরে যাওয়া আসা করতে চাইলে হয় আমাদের বলতে হত, নয়তো বড় ফটকে দরওয়ানের কাছে যেতে হত। চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতর থেকে খিল দিলাম।

রান্নাঘরের পাশে আরেকটি ঢুকবার পথ ; সে দরজাও বন্ধ, বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তার চাবিও আমার একটি আছে। খুলে ঢুকলাম, অমনি যেন প্রকাণ্ড খালি বাড়িটা আতঙ্কে দুহাত শূন্যে তুলে হাঁ-হাঁ করে আমার দিকে ছুটে এল। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম, একসঙ্গে দুটো আলো জ্বলে একতলার এদিকটার অন্ধকার ঘুচিয়ে দিল।

বাড়িতে যে সত্যিই কেউ নেই সে আর বলে দিতে হল না। কি যেন একটা অজানা নিদারুণ দুর্ভাবনায় মনটা ভারি হয়ে উঠল। সারা পথ আলো জ্বালতে জ্বালতে দোতলায় নিজেদের ঘরে

পৌঁছলাম। পড়ার টেবিলের টানার মধ্যে যত্ন করে পরীক্ষার প্রবেশপত্রটা রাখলাম। এই আমার নিষ্কৃতির চাবিকাঠি ; এ বাড়িতে আর আমার একদিনও থাকতে ইচ্ছা করে না ; এতকাল কি করে কাটালাম তাই ভাবি।

হাতমুখ ধুয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু সমস্ত জনশূন্য বাড়িখানি থেকে হাজার রকম খুটখাট খসখস শব্দ কানে আসতে লাগল ; আরো বেশি কিছুর জন্যে কান পেতে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আর সইতে না পেরে ভাবলাম একবার দরওয়ানকে জিজ্ঞেস করে দেখি মেসোমশাই আজ বাইরে খাবেন কিনা ? রোজ বেরুবার সময় তাকে বলে যান কটার সময় ফিরবেন। নিশ্চয় বাড়িতে খাবেন না, তাই রাঁধাবাড়ার কোনো বালাই নেই ; লছমি জানে পঞ্চমীদিদি আর আমি এ বাড়ির ফালতু বাসিন্দা, খিদে পেলে নিজেরাই যা হয় করে নেব।

সব আলো জ্বালা রইল, দরজা খোলা রইল, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিটুকু পার হয়ে দেখি দরওয়ানের ঘরেও তালা ঝুলছে, বড় ফটক বাইরে থেকে বন্ধ। তবে কি মেসোমশাই রাতেও ফিরবেন না ? হঠাৎ মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গেল, আকাশের কালো মেঘ ততক্ষণে আরো ঘন হয়ে এসেছে, চারদিকটা থমথম করছে। এক দৌড়ে আবার সদর দরজা দিয়ে হলঘরে ফিরে এলাম। নিজের বুকটার ধড়াস ধড়াস শুনতে পাচ্ছিলাম। এমন সময় মনে হল তিন-তলা থেকে ভারি পায়ের শব্দ ধাপধাপে নীচে নেমে আসছে। বার দুই চিৎকার করে ডাকলাম—'কে ? বুড়োদাদু আপনি নাকি ?' কোনো উত্তর নেই, শব্দটা আরো নীচে নেমে আসতে লাগল।

আর অপেক্ষা করলাম না, নীচের সব দরজা খোলাই ছিল, নিমেষের মধ্যে খিড়কির খিল খুলে গলিতে বেরিয়ে বাইরে থেকে তালা টিপে দিলাম। হাত-পা এত কাঁপছিল যে দেয়াল ধরে একটু অপেক্ষা করতে হল। ও ফুটপাথ থেকে আনন্দ তাড়াতাড়ি রাস্তা

পার হয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল—'কি? কি হল? কোন বিপদ হয় নি তো?'

গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না, নীরবে মাথা নাড়লাম। আঃ, মানুষের সঙ্গ কি ভালো, বেঁচে থাকো আনন্দ। আনন্দের মুখের দিকে চেয়ে মনে বল পেলাম; ভাষা ফিরে এল; বললাম, 'কি জানি, খালি বাড়িতে কেমন যেন লাগছিল। দরওয়ানও ফটকে তালা দিয়ে চলে গেছে। তাছাড়া—' এই অবধি বলে আমি থামলাম।

আনন্দ বলল—'তা ছাড়া কি?'

'কে যেন অন্ধকারে তিনতলা থেকে আস্তে আস্তে নামছিল। ডাকলাম, সাড়া দিল না।'

আনন্দ বলল, 'আমি যাব? গিয়ে দেখে আসব?'

বললাম—'না, না, তাহলে মেসোমশাই আমাকে আস্ত রাখবেন না। আপনার ওপর তাঁর ভারি রাগ।'

আনন্দর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। 'তা হলে এখন কোথায় যাবেন?'

'ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কাছে পঞ্চমীদিদির খবর পাওয়া যেতে পারে। সেখানে তার কাজ ছিল, কে জানে হয়তো সেখানেই বসে আছে।' শেষ পর্যন্ত আনন্দকে সঙ্গে নিয়েই ডাক্তারবাবুর বাড়ি অবধি যেতে হল, দোরগোড়া থেকে তাকে বিদায় করে ভিতরে গেলাম। ভিতরে আলো জ্বলছে, হলঘরের বেঞ্চিতে রুগীরা বসে আছে, আঃ কি সুন্দর, সাধারণ, স্বাভাবিক। আমি পাশের বারান্দা দিয়ে ঘুরে অন্দরে গেলাম। আনন্দ বারবার সাবধান করে দিয়েছিল যেন রাতটা এখানে কাটাই, খালি বাড়িতে যেন না ফিরি। পঞ্চমীদিদি সঙ্গে থাকলেও না।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী কোথায় হরিনাম শুনতে গেছেন। ঝি বলল, পঞ্চমীদিদি তিনটের সময় এসে কি সব ওষুধপত্র নিয়েছিল, তারপর কে একজন বাবু একটা চিরকুট নিয়ে পঞ্চমীদিদির খোঁজে এসেছিল,

চিঠিটা পড়েই সে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ওষুধপত্র, চিরকুট সব সেই ইস্তক টেবিলের ওপর পড়ে আছে। ঝি এখন বাড়ি যাচ্ছে।

কাছে গিয়ে দেখি একটা শিশিতে কার্বলিক অ্যাসিড, একটিতে সাপের কামড়ের ওষুধ। চিঠিতে তারিখ ঠিকানা কিছু নেই; অশিক্ষিত হস্তাক্ষরে মাত্র দুটি লাইন লেখা—শ্রীচরণেষু বৌ-ঠাকুরুণ, যেমন কথা হইয়াছিল সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। আর বিলম্ব করিলে সব পণ্ড হইবে। ইতি শ্রী বি।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার, এ কোন নতুন বিপদে পঞ্চমীদিদি পড়ল কে জানে, নাকি আর যা যা ঘটেছে সবই এই বিপদেরই প্রস্তুতি। পঞ্চমীদিদির এত দিনের আশঙ্কা কি কোনো মহা সর্বনাশে শেষ হল নাকি?

এখন কি করি? বুড়ো ডাক্তারবাবুর প্রায় সত্তর বছর বয়স, ঘরভরা রুগী, তাঁকে কিছু বলা যায় না। কিন্তু পঞ্চমীদিদি তার দেরাজের :জামা-কাপড়ের নীচে থেকে একদিন একটা রঙচঙে সাবানের বাক্স খুলে, একটা চিঠি বের করে, আমার কাছে তার দেওরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। চিঠিতে দেওরের ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য তখন' আমি চিঠির দিকে তাকাইও নি। কিন্তু তাহলে যে আবার আমাকে বাড়িতেই ফিরতে হয়।

বাড়ি ফেরার নামে বুকটা ধুকপুক করতে লাগল। অথচ গৃহহীন আমার ছোটবেলাকার একমাত্র আশ্রয় এই বাড়ি। তখনো মেসোমশাই এ বাড়ির কর্তা ছিলেন, যদিও বাড়িটা ছিল তাঁর শ্বশুরের নামেই। মেজমাসির মৃত্যুর পর তাঁর ছোট বোনকে যখন মেসোমশাই বিয়ে করলেন, বাড়িটা তখন শ্বশুর মেয়ের নামে দানপত্র করে দিয়েছিলেন। তখনো আমি এরই ছাদের নীচে বাস করি, আমার নিজের বাড়ি কোথাও যদি থেকেও থাকে কেউ তার খোঁজ পায় নি। আজ আমি সেই বাড়িতে ফিরতে ভয় পাচ্ছি।

যেমনি ছোটবেলার কথা মনে হওয়া, স্মৃতিতে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। এই তো আমার দুঃখী জীবনের একমাত্র আশ্রয়; মেসোমশাইরা ছাড়া আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই। অমনি আমার মনের ভয় কোথায় দূর হয়ে গেল। নিশ্বাস বন্ধ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সেই চির পরিচিত খিড়কি-দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

তালায় চাবিকাঠিটি লাগাবার আগে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলাম, অন্য ফুটপাথটি খালি খাঁ খাঁ করছে। একবার মনে হল বটে, গ্যাসবাতির নীচে একটা লোক যদি পাইচারি করত তবে মনে কত জোর পেতাম, আবার তখুনি সে দুর্বলতাটুকুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরোলাম। খট্ করে অস্বাভাবিক রকম জোরে শব্দ করে তালার মুখটা খুলে পড়ল, মনে হল শূন্য গলিটার চারপাশ থেকে খট্ শব্দটার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

খিড়কি-দোর খোলাই থাকল, আমি প্যাসেজটুকু পার হয়ে রান্নাঘরের পাশের খোলা দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। দরজা তো খোলা থাকবেই, আমি নিজেই খুলে রেখে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে আলো জ্বালবার জন্য হাত বাড়িয়েছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে আবার হাত নামিয়ে নিলাম। আমি তো আলোও জ্বেলে রেখে গিয়েছিলাম, খালি বাড়িতে তাহলে আলো নেবাল কে? তবে কি মেসোমশাই ফিরে এসেছেন? না কি অভ্যাস মতো হারু খানসামা তার সাহেবের আগমনের আধঘণ্টা আগে এসে হাজির হয়েছে?

এ সব মনকে চোখ ঠারা ছাড়া আর কিছু নয়। হারু এলে রান্নাঘর আর বাসনের ঘরের আলো জ্বলত।

সারা জীবনের চেনা বাড়ি, চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি এর প্রত্যেকটি কোণায় কি আছে। এই অন্ধকারে কোনো কিছুতে ধাক্কা না খেয়েই আমি স্বচ্ছন্দে দোতলায় আমার নিজের ঘরটাতে চলে

যেতে পারি, যে ঘরের দরজা বন্ধ করে পঞ্চমীদিদি আর আমি নিরাপদে কত বছর কাটিয়েছি। আলো আমার দরকার নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি পরিচিত অন্ধকার কোণে যেন অদৃশ্য অভাবনীয় শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আলো জ্বালতে আমার ভয় করছিল। অন্ধকারের আবরণে একটা নিরাপত্তা আছে, আলো জ্বাললেই সেটা ঘুচে যাবে, তখন আমি নিতান্ত নগ্ন নিরলম্ব হয়ে ধরা পড়ব।

ধরা পড়ব? কার কাছে ধরা পড়ব? সত্যিই কি পঞ্চমীদিদির পুরোনো রোগটা আমাকে পেয়ে বসেছে? সে যাই হোক, এখন পঞ্চমীদিদিকে বাঁচাতে হবে। আমাদের ঘরে গিয়ে, পঞ্চমীদিদির দেরাজের ঠুনকো তালাটা ভেঙে, কাপড়-চোপড়ের তলা থেকে চিঠিতে লেখা দেওরের ঠিকানা বের করতে হবে।

তারপর? তারপর আনন্দকে সেটা দিতে হবে, বাকি কাজ সে করবে। কথাটা ভেবে নিজেরি আশ্চর্য লাগল, কি করে আমি নিশ্চিত জানলাম যে সে করবে? বুড়োদাছুর ছেলে বলে? তাই কি ভালো লাগে?

মাঝখানে বড় হলঘর, তার এক ধার দিয়ে চওড়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনের দরজা তখনো খোলা, সামনের বাড়ির দেয়ালে গাঁথা বিজলী বাতির আলোর একটা চওড়া ফালি সিঁড়ির তলাটা আর আট-দশটা ধাপের ওপর এসে পড়েছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল

টের পেলাম বাড়িতে আমি একা নই। আমার গায়েও খানিকটা আলো পড়েছে, আমি একদৃষ্টে সিঁড়ির দিকে চেয়ে আছি। দোতলা থেকে কি কেউ নেমে আসছে? না কি সবই আমার কল্পনা, পঞ্চমীদিদির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া? পঞ্চমীদিদির কথা মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল? হয়তো সত্যিই বারুইপুরের বিশাল সম্পত্তির সে আট আনার মালিক। তাকে সরাতে পারলে দেওর সবটাই পায়।

আজ আমার সবকিছু সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আটটা ধাপ উপরে আলোর ফালিতে একটা মানুষের মূর্তি দেখা দিল।

আমার নড়বার চড়বার ক্ষমতা চলে গেল, একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। রোগা লম্বা মিশকালো, কপালে একটা কাটার দাগ, খুনেদের চোখ, সরু চকচকে বাঁকা। ঠোঁট নেই, পাৎলা একটা দাগের মতো; ছোট করে চুল কাটা, গলাবন্ধ মেটে রঙের কোট আর আধময়লা ধুতি পরা। কোটের পকেট থেকে একটা রেশমি দড়ির ফাঁস ঝুলে রয়েছে। কত চেনা, কত জানা, পঞ্চমীদিদির মুখে কতবার শোনা।

এক ধাপ এক ধাপ করে সে আমার কাছে আসতে লাগল. রেশমি দড়ির ফাঁস কখন পকেট থেকে হাতে উঠে এল টের পেলাম না। হঠাৎ তিনতলার ওপর থেকে হুড়মুড় শব্দ আর সে যে কি বিকট স্বরে বুড়োদাদু চিৎকার করে উঠলেন—'ওরে টুনি পালা, পালা, পা'—কেমন যেন থপ করে থেমে গেলেন, কথাটা শেষ হল না।

কোথা থেকে দেহে শক্তি ফিরে এল, প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম—'মেসোমশাই! মেসোমশাই!' আমারি ঘরের দরজা খুলে মেসোমশাই বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালেন। আঃ, বাঁচা গেল, আর কোন ভয় নেই। কিন্তু কে এ? এই কি আমার মেসোমশাই? মেসোমশাইয়ের কি এই রকম সাদা পাথরের তৈরি মুখ? আর তবে আশা নেই। বিদ্যুৎ বেগে ফিরে অন্ধকারের নিরাপদের দিকে দৌড় দিলাম, অমনি কোথা থেকে সরু লিকলিকে কোমল মোলায়েম একটা বাঁধুনি আমার গলা চেপে ধরল। আমার বুক থেকে সমস্ত নিশ্বাস চিপে বের করে দিতে লাগল, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, চোখে সর্ষে ফুল দেখলাম। তারপর একটা বিরাট অন্ধকার আস্তে আস্তে আমাকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করল।

তারি মধ্যে, সেই বায়ুশূন্য ব্যথার মধ্যে, সেই কানে তালা ভেদ করে, চোখের সর্ষে ফুলের মধ্য দিয়ে টের পেলাম চারিদিক থেকে কত লোকজন নিয়ে আনন্দ ছুটে এসেছে।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, আমার গলার বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে, সেই লোকটাকে আর দেখতে পাচ্ছি না, বুড়োদাদুর গলা শুনছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সে যে কি বিকট একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। আনন্দ আমাকে ডাকল—'টুনি, টুনি!' চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, আর কিছু মনে নেই।

মনে হল কত যুগ কেটে যাবার পর আবার চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম। বুড়োদাদু আমার মাথার পাশে বেতের গোল চেয়ারে বসে আছেন। আস্তে আস্তে আমার চোখ বেয়ে গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল, বুড়োদাদু আর কিছু না পেয়ে ধুতির খোঁট দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর ঠোঁট দু'খানি থরথর করে কাঁপছে। আমার গাটা খালি খালি কেঁপে উঠতে লাগল। ভাঙা কর্কশ গলায় বললাম—'পঞ্চমীদিদি বেঁচে আছে তো?'

অমনি ঝড়ের মতো পঞ্চমীদিদি আমার বুকের ওপর পড়ল— 'ওরে আরেকটু হলেই কি সর্বনাশটা করে ফেলেছিলি! আমাকে বাঁচাবার জন্যে ফাঁসের দড়িতে গলা দিয়েছিলি রে, এ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।'

আনন্দ এসে পাশে দাঁড়াল—'ও পঞ্চমীদিদি অমন করবেন না, ওর শরীর এখনো দুর্বল।'

তাই তো, আমি তো হাতে জোর পাচ্ছি না গলায় আমার বড় ব্যথা লাগছে। আনন্দ একটা ঠাণ্ডা নরম আঙুল সেই ব্যথার ওপর বুলিয়ে দিল। আঃ, বুকটা আমার জুড়িয়ে গেল, কত বছরের কত দুঃখ গলে জল হয়ে, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রাণটা হাল্কা হয়ে গেল।

কিন্তু—কিন্তু—বুড়োদাদু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'কি টুনি, কি খুঁজছ, কাকে চাও ?'

'কি যেন একটা বিকট শব্দ শুনেছিলাম, হুড়মুড় করে কে যেন পড়ল—মেসোমশাই কোথায় ?' তারা এমন করে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল যে আমার বুঝতে বাকি রইল না মেসোমশাই অমন করে পড়েছিলেন। মেসোমশাই আর নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল। সে বছর আমার পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। মাসিকে আর তার ছেলেমেয়েকেও অনেক দিন পরে দেখেছিলাম, যখন আনন্দকে আর আমাকে সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। তখন সব চুকে বুকে গেছে, সবাই নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাসির সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখে, জীবনে এই প্রথম তার জন্যে কান্না পেয়েছিল। মাসি কিন্তু কাঁদে টাঁদে নি।

কতক কতক শুনেছিলাম বুড়ো দাদুর মুখে, কিছু আনন্দ বলেছিল। এইসব ব্যাপারের অনেক দিন আগেই স্পেকুলেশন করে মেসোমশাই সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, সে কথা কেউ জানত না, মাসিও না। মাসির মন পাবার আশা তিনি বহুকাল হল ছেড়ে দিয়েছিলেন, টাকা রোজগারের দিকেই মন দিয়েছিলেন, এখন মরীয়া হয়ে অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে আশার আলো দেখলেন।

ওঁদের এটর্নী আপিসে খবর এল আঠারো বছর আগে হাঙ্গামার সময়, সেই লুটপাট করা বাড়িতে, মুখ-বাঁধা ছালায় যে বেহুঁস শিশুগুলিকে পাওয়া গেছিল, তার মধ্যে দু-বছর বয়সের যে অভাগী মেয়েটা ছিল, যার দুই ভুরুর মাঝখানে কুচকুচে কালো গোল একটা তিল আর গলায় ছোট লাল জরুল আছে, তার আত্মীয়-স্বজন তিন-কুলে কেউ বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তার দাদামশায়ের আমেদাবাদের কাপড় কলের অনেক সম্পত্তির সে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

সম্পত্তির ট্রাষ্টিরা এতকাল ধরে অনলসভাবে খোঁজ করে, সেই পুরোনো সমাজ-সেবক সঙ্ঘের কাছ থেকে শিশুগুলির উদ্ধারের খবর পেয়েছেন এতকাল বাদে। সঙ্ঘের পুরোনো নথিপত্রে শিশুদের ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের খুঁটিনাটি সুদ্ধ বর্ণনাও লেখা আছে।

হাঙ্গামায় আমার সব আত্মীয়-স্বজনরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, শুধু দাদামশাই আমেদাবাদে ছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি খুবই অসুস্থ, মাস দুই পরে মারাও গেলেন, মারা যাবার আগে তাঁর আদরের মেয়ে, জামাই ও নাতনির বিশদ বর্ণনা দিয়ে, তাদের খুঁজে বের করার জন্যে ধার্মিক ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরাই এতকাল পরে খোঁজ পেয়ে সেবা-সঙ্ঘের খাতা-পত্র ঘেঁটে আমার হদিস পান আর গার্জিয়ান হিসাবে বুড়োদাদুর নিজের হাতে লেখা মেজ মাসির নাম-ঠিকানা পান।

এই অবধি বলে বুড়োদাদু এত ভেঙে পড়লেন যে, বাকিটা আনন্দের কাছে শুনতে হল। মেসোমশাই স্থির করলেন যে, আমাকে সারাজীবন প্রতিপালন করার প্রতিদান স্বরূপে আমার দাদামশায়ের সম্পত্তিটি তিনি হস্তগত করবেন। তদন্তের কথা কাউকে বললেন না। অথচ আমিই যে সেই মেয়ে, আমার ভুরুর মাঝে কালো তিল আর কনুইয়ে জরুল তার প্রমাণ।

আসলে তিনি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, নইলে সব দিক গুছিয়ে এমন প্ল্যান করা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। বুড়োদাদু ব্যাপারটা জানলেন অনেক পরে, যখন সমাজ-সেবক সঙ্ঘের পুরোনো সেক্রেটারির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। ততদিনে মেসোমশায়ের কথায় বুড়োদাদু তাঁর খুদকুঁড়ো থেকে পঞ্চমীদিদিকে আর আমাকে দু'কাঠা করে জমি দিয়েছেন, আমরা উইল করে বুড়োদাদুকে সর্বস্ব দিয়েছি, বুড়োদাদুও কিছু সন্দেহ না করে লেখাপড়া করে তাঁর সর্বস্ব মেসোমশাইকে দিয়েছেন, তাঁর কাছে অনেক দেনা রয়েছে তার

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। এবার আমি চোখ বুজলেই মেসোমশাইয়ের সমস্যা ভঞ্জন হয়।

বুড়োদাদু তখন নিজেই আবার বললেন, 'লোক লাগানো হল আপদ সরাবার জন্যে; সে আবার ভুল করে পঞ্চমীর পেছনে লাগল। এদিকে তুমিও পঞ্চমীর কথা বিশ্বাস করলে না। সাবধানও হলে না। আমি যেই না তোমার সম্পত্তি পাওয়ার কথা শুনেছি, তোমাদের উইলের কথা মনে করে কেমন যেন দুর্ভাবনা হল, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। সে রাত্রে উপেন আমাকে যা বলল সে আর নাই বললাম বিশেষ করে সে যখন আর নেই। তারপর পাছে আমি সব কথা ফাঁস করে দিই, আমার মুখ হাত-পা বেঁধে দুদিন তার কাপড় ছাড়ার ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। পরিবার পাছে জানতে পারে তাই তাদের মা'র কাছে পাঠাল। বাকিটা তো তুমি জানই। তোমাকে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আনন্দ পুলিশের লোক দিয়ে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলবার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। তাকে আমি সব কথা জানিয়েছিলাম, আমি নিখোঁজ হওয়াতে তার বড় ভাবনাও হয়েছিল। তুমি যে অত শীগগির বাড়ি ফিরবে, ওরা ভাবে নি তাই আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। শেষটা যখন উপেন দেখল এত করা সত্ত্বেও সব পণ্ড হয়ে গেল তখন সে দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সব জ্বালা জুড়ুল।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—'আর পঞ্চমীদিদির দেওর?'

পঞ্চমীদিদি নরুন-পেড়ে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, গলায় শাশুড়ীর মোটা বিছে হার, হাতে এই বড় পলার আংটি পরে, নড়েচড়ে বসল।

'কতবার বলি নি তোমাকে—বারুইপুরে আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো, দেওর নিয়ে যেতে চায়, তার বৌ মরেছে, তা তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।'

'কি করে করি? এদ্দিন নেয় নি কেন?'

'আরে ওর বাপবুড়ো যে বেঁচে ছিল, আমার বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া ছিল, বড় ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছিল, তারপর সব মরে ঝরে সাফ। এখন দেওরের বাড়ি আমি না আগলালে কে আগলাবে বল।'

আস্তে আস্তে আমার জীবনের নক্সার ছবিগুলো যে যার নিজের জায়গায় বসল, আমি একটা আস্ত মানুষ হয়ে গেলাম। মাসি আর ও বাড়িতে আসে নি, বাড়ি বিক্রি করে তার মার কাছে গিয়ে উঠল, সেইখানেই সুকু, মেমি, মালা মানুষ হচ্ছে। লছমি তার কাছেই আছে। সোনার সেই বছর বিয়ে হয়ে গেল; সাগরকে তার দিদিমা বিলেত পাঠাল। সেইখানেই বিয়ে থা করে সে বসবাস করছে। পঞ্চমীদিদি মনের সুখে তার শ্বশুরের ভিটেয় দেওরের ছেলে আর ননদের নাতনিকে মানুষ করছে। আমাদের মধ্যে খুব যাওয়া-আসা আছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না।

আর আমি? বুড়োদাদুর শেষ বয়সে তাঁর সেবাযত্ন করবার অধিকার পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি, তারপরে বাড়িতে পড়ে এম-এও পাশ করেছি। আনন্দ পুলিশে কাজ করে, তখনো করত। সারা জীবন তারও সেবাযত্ন করতে চাই, তার বেশি আর কিছু চাই না। আমার দাদামশাইয়ের টাকার অর্ধেক অনাথ আশ্রমে দিয়েছি, যাতে আমার মতো অনাথা অভাগী দু-একজন আশ্রয় পায়। হাত জোড় করে প্রার্থনা করি শেষে তারাও আমার মতো সুখী হোক, পৃথিবীর আনন্দরা তাদের খুঁজে পাক।

বাঁশের ফুল

এতক্ষণ মায়ার বুক ঢিপঢিপ করছিল ; এবার পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই দেখল কই তার মনের নিবাসটি তো এতটুকুও বদলায় নি। অমনি গত সতেরোটা বছর নিমেষের মধ্যে 'না' হয়ে গেল ; তার আগেকার সতেরো বছর হুড়মুড় করে এসে বুক জুড়ে বসল। কত নিশ্চিন্তে ছিল তখন, কত শান্তিতে ছিল। কানায় কানায় ভরে গেল বুকটা, চোখ দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। সূর্যের ম্লান আলোর দিকে তাকাতেই রামধনু দেখল মায়া। এই তো তার বাড়ি এ-ছাড়া আবার বাড়ি কোথায় ?

কি আশ্চর্য, এই সতেরো বছরে বুকের ওপর দিয়ে জগন্নাথের রথ চলে গেল অথচ সারাক্ষণ এই তার প্রাণের নিবাস যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিই আছে। সকালের রোদে সরু পাহাড়ে পথের মাটি ছোঁয় নি তখনো ; ঘাসের ওপর শিশির জমে বরফ হয়ে আছে ; আগেও যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে। মায়ার পায়ের চাপে সেগুলো মুটমুট করে ভাঙতে লাগল। চেয়ে দেখল পথের পাশের সরু ঝরণার জলের ওপরটা আগের মতোই খুদে খুদে ঢেউসুদ্ধ জমে আছে, তার তলা দিয়ে ফুসফুস করে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনের পাখি ডানা ঝাপটে নামবার জায়গা খুঁজতে লাগল।

পথের এক পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথুরে খোঁদলে তেমনি ফোঁটা ফোঁটা জল চোঁয়াচ্ছে ; সে-জল জমে যাবার সময় পায় না। তেমনি মরা সরল গাছের গুঁড়িতে তাকের মতো ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে

শীতে কালো হয়ে রয়েছে। এখন বড় শীত। ছোটবেলার ঠাণ্ডা জলের কলের নিচে হাত ধরলে মনে হত কেটে যাচ্ছে।

শীত? কোথায় শীত? এই তো কেমন মায়ার বুকের জমা বরফগুলো গলে গিয়ে নদী হয়ে ছুটে চলেছে। আরেকটা বাঁক ঘুরতেই সেই অবিশ্বাস্য বাড়িটাও দেখা গেল। তার চার পাশের কুয়াশা তখনো মিলিয়ে যায় নি। মনে হচ্ছিল জানলা দরজা স্কাই লাইট চিমনি, সব নিয়ে আগেকার মতো শূন্যে ঝুলে আছে আর চারধারের মাটি নিচু হয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। কই, কিছু তো বদলায় নি, সব যেমন ছিল তেমনি আছে। আঃ কি শান্তি, কি আরাম। কুলি-মেয়ের পিঠে মায়ার ছোট স্যুটকেস আর বিছানা। সে এবার এগিয়ে এসে পাহাড়ি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'স্কুলে যাবেন তো মিস-সাব?' মায়া চমকে উঠে লাল বাড়ীটাকে দেখিয়ে দিল। পথ ছেড়ে চা-বাগানের ধারে ধারে পাথরের ধাপ ধরে নেমে সরু উপত্যকার ওপারে আবার পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাড়িটার রসুইখানার একেবারে সামনে গিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু সারি সারি বড় বড় পিপের মতো লোহার ঘ্যালামাণ্ডারে এ সময়ে জল গরম হবার কথা, সে-সব কোথায় গেল? চেনা জিনিস দেখতে না পেলে মন কেমন করে।

তবে কি! তবে কি!! এতক্ষণ পরে শীতের চোটে মায়ার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরে গেল। ঠাণ্ডা অসাড় হাতে ব্যাগ খুলে পোস্টকার্ডখানা বের করে আরেকবার পড়ে দেখল 'পত্রপাঠ চলে এসো। আমি বড় বিপন্ন। এস গনজ্ঞালেজ।' তবে আবার কি। স্বয়ং বড় মেমসাহেব ডেকেছেন। কোন ভাবনা নেই। হঠাৎ মনে পড়ল বড়-মেমের তো এতদিনে আশীর ওপরে বয়স হয়েছে। তাঁর তো বেঁচে থাকারই কথা নয়। চেয়ে দেখল বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। কিন্তু এই মাঝ-নভেম্বরের শীতে সে-তো থাকবেই। লাল করগেট ছাদ বেয়ে টুপ-টুপ করে হিম-গলা জল পড়ছে। ততক্ষণে

ওধারের পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্য দেখা দিয়েছে, বাড়ির মাথায় ভিড করা আটটা চিমনির চোঙায় রোদ লেগেছে। ছাদের ঈষৎ জমা হিম কতক্ষণই বা থাকে।

কুলি-মেয়ে বলল, 'জনি-বাবা ছাড়া আটটার আগে কেউ ওঠে না। বড্ড কুঁড়ে। এই সময়ে জনি এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ওর মাকে খোঁজে।' নির্বোধের মতো কুলি-মেয়েটা হাসতে লাগল। মায়া তো অবাক। 'জনিবাবা কে?'

'কেন, বুড়ি মেমের নাতনীর ছেলে। ওর মা ওকে ফেলে দু বছর হল পালিয়ে গেছে আর ও কিনা এখনো তাকে খুঁজে বেড়ায়।'

মায়ার বুকের মধ্যে কি যেন ধড়াস করে উঠল। জনির বয়স কত? কি জানি, মিস-সাব, ছয়-সাত হবে। বড় দুষ্টু। মায়ার গলার মধ্যে টনটন করে উঠল। এগারো বছর আগেকার আরেকটা ছোট ছেলের মুখ মনে পড়ল। সে মায়ার মুখে হাত বুলিয়ে বলেছিল, মা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তুমি কোথায় গেলে? দম বন্ধ হয়ে এল মায়ার, সতেরো বছর কখনো 'না' হয়ে যেতে পারে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে টেনে বেড়ায়। বুকের মধ্যে হু-হু করে।

হঠাৎ কোথা থেকে ছোটখাট একটা ঝড় এসে মায়ার বুকে আছড়ে পড়ল। মামি! মামি! কোথায় গেছিলে তুমি? দুটো কনকনে ঠাণ্ডা হাত, এক মাথা রুক্ষ চুল, খড়খড়ে পুরু বোনা সোয়েটার গায়ে, কালচে লম্বা প্যান্ট পরা, নীল নীল ছাই রঙের চোখ অযত্নে মলিন, এ কাদের ছেলে? মায়ার বুকে মাথা ঘষে নোংরা ছেলেটা বলল, এনেছ আমার জন্য প্রেজেন্ট? মায়া তার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'এনেছি, এনেছি চল আগে ঘরে ঢুকি।'

দোতলায় একটা জানলা খুলে গেল তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল, 'জন ফের বেরিয়েছ'? কিন্তু জন ততক্ষণে হাওয়া। কুলি-মেয়ে পিছনের সবুজ দরজার সামনে সিঁড়িটুকু পেরিয়ে ঘণ্টার দড়ি টানতেই দরজা খুলে গেল।

এ বাড়িতে যারা পায়ে হেঁটে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, তারা এই দরজা দিয়েই ঢোকে। আর যারা দশ মাইল ঘুরে মোটরে চড়ে কিংবা ঘোড়ায় চেপে বড় গেট খুলে ঢোকে তারা সদর দরজার ঘন্টি টেপে। এই নিয়মই বরাবর চলে আসছে, এতে অসম্মানের কিছু নেই। যার যা প্রাপ্য। মায়া চাকরী করতে এসেছে, এ দরজা দিয়ে ঢুকবে না তো কোথা দিয়ে ঢুকবে ?

মোটা সোয়েটারের ওপর কালো কোট-প্যান্ট পরা একজন বেজায় বুড়ো লোক দরজা খুলতেই, কুলি-মেয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলল মিস-সাবকে নিয়ে এসেছি বাটলার সাব। লোকটি ভাঙ্গা গলায় বলল, 'গুড় মর্ণিং। ওকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করে দিন। সাঁইলা আপনার জিনিস ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। আপনিও ওর সঙ্গে যান, আমি গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে চা পাঠাব। বড়-মেমসাব আটটায় ওঠেন।'

সাঁইলার সঙ্গে মায়া ঘরে গিয়ে দেখে খাটের ওপর জান বসে আছে। কই দাও আমার নতুন বই। সাঁইলা বলল, জনি-বাবা তুমি মিস-সাবকে দিক করছ আমি বড়মেমকে বলে দেব। মায়া বলল, না না, আমাকে কিচ্ছু দিক করছে না। তুমি আমার গরম জল নিয়ে এসো। জনিও আস্কারা পেয়ে লাল টুকটুকে জিভের একটু-খানি আগা দেখাল।

সুটকেসের ওপরেই ছিল দুটো বই ; মোটর, ট্রাকটর, ট্রেনের ছবি একটাতে, এরোপ্লেনের ছবি অন্যটাতে। জনির হাতে বই দিতেই সে বদলে গেল। চোখ ছল ছল করে উঠল ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, 'থ্যাঙ্কিউ'। তারপর বই ফেলে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি-আমি রোজ ভাবি তুমি আমার বই নিয়ে কবে ফিরে আসবে।

মায়া ভাঙ্গা গলায় বলল, এই তো এসেছি।

আর চলে যাবে না ?

মায়া একটু ইতস্তত করে বলল, না।

জনি বই খুলে মায়ার খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর গরম জল এল। মায়া হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে তৈরি হয়ে এল। মস্ত স্নানের ঘর জানলার পাশে লম্বা আয়নায় নিজের লম্বা হাতা উলের জাম্পার আর স্ল্যাকস-পরা চেহারাটি দেখে নিজেই চমকে উঠল। কোঁকড়া চুলগুলোকেও কান অবধি ছেঁটে ফেলতে হয়েছিল। দেখে কে বলবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নয়। হাসি পেল মায়ার। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আবার কি? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বললেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ফরসীরা তো কোন কালে হয় ইউকেতে নয় অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেছে। যারা আছে তাদের গায়ের রং মায়ার চাইতে কালো বই ফরসা নয়। বড়-মেম নাকি নেটিভদের ওপর হাড়ে চটা। দশ পুরুষ ধরে ওঁরা নাকি নেটিভদের ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছেন, এই সব দুদিনের ইংরেজদের চাইতে অনেক আগে থেকে। ওঁরা নাকি খাঁটি পর্তুগীজ; সাড়ে তিনশো বছর আগে কুইলনের একরকম রাজা ছিল নাকি ওদের পূর্বপুরুষ। বেজায় বড়লোক ছিল বড় বড় বোম্বেটে জাহাজ খাটত ওদের। অন্ততঃ তাই বলত মায়ার ছোটবেলাকার সহপাঠিনী গোয়েন এই বড় মেমের নাতনী। ভারী সুন্দরী ছিল গোয়েন। আর তাই নিয়ে গর্ব কত!

সাঁইলা ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতেই জনি বই নামিয়ে বলল, আমিও তোমার সঙ্গে খাব মামি আগে যেমন খেতাম।

সাঁইলা বলল, খানা কামরায় তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে চল শীগ্‌গির। জনি শুয়ে পড়ে বলল, খাব না, যাও।

মায়া প্রমাদ গণল। যাও না জনি, খেয়ে এসো। আমি তোমার গ্র্যানিকে বলব, এর পর থেকে তুমি আমার সঙ্গে খাবে। কিন্তু মন বলছিল—জড়িও না, জড়িও না, যে কথা রাখতে পারবে না সে-কথাও দিও না। ততক্ষণে কথাটা বলা হয়ে গেছে। কাঠ

হেসে মনকে মায়া বলল, দুটি জিনিস ফেরানো যায় না, জ্যা-মুক্ত তীর আর বলে ফেলা কথা।

বাটলার এসে দরজায় দেখা দিল। জনি বাবার খাবারও এখানে নিয়ে আসছে। বড়-মেম তাই বলেছেন। টেবিলের হালচাল ওর শেখা দরকার। আমরা সারভেন্ট, আমরা কত শেখাব? উঠে হাত-মুখ ধুয়ে এসো জনি।

চারদিকের পাহাড়ের মাঝখানে জ্বলজ্বল করতে থাকে এই লাল করুগেট ছাদের কাচের জানলায় মোড়া বাড়ি। লোকে বলত নাকি চারদিকে কুড়ি মাইল দূর থেকে এ-বাড়ি দেখা যায়, ছোট একটা আলাদা পাহাড়ের চূড়োর সবখানি জুড়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কিম্বা বৃষ্টিতে ভিজছে। শীতকালে যখন হিমালয়ের দিক থেকে চব্বিশ ঘণ্টা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইত তখনো সারা বছরের রোদের স্মৃতিমাখা কাচের জানলার ভিতরে গাঢ় লাল কম্বলের পর্দা টেনে আটটা চিমনি থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে এ-বাড়ির লোকেরা সুখে কাল কাটাত।

পাশের পাহাড় আরো উঁচু হলেও এ চূড়ো সাত হাজার ফুটের-ও বেশি উঁচু নাকি যে জানালা দিয়ে তাকানো যায় সেখান দিয়েই বরফের পাহাড় দেখা যায়। এত উঁচু থেকে দেখলে মনে হয় দিগন্ত আঁকড়ে ধরে বরফের পাহাড়ও গোল হয়ে ঘুরে এসেছে। দিনে কি ঘন নীল আকাশের রং রাতে কি ঘোর বেগনি তার ওপর তারা খচিত; এক রাশি রাশি তারা পাহাড়ে না চড়লে দেখা যায় না।

বাড়িটা আরো খানিকটা পুরনো হয়েছে, নইলে কোথাও এতটুকু বদলায় নি। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ী বাঁশের ঝোপ; কি তার শোভা। কত কাজে লাগত ঐ বাঁশ গাছ। গাঁটে গাঁটে কেটে চাল মাপা, দুধ বয়ে নিয়ে যাওয়া, কচি বাঁশের কোঁড় খাওয়া, এসব এখানকার লোকদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ ছিল। স্কুলে যে সব আয়ারা কাজ করত, পদ্মা পম্পা চন্দ্রমায়া তারা ছিল মায়ার

নিত্য সঙ্গিনী। তারা এই 'লাল কুঠির' গল্পে পঞ্চমুখ। বড়মানুষের গল্প বলতে পারলে গরীবরা আর কিছু চায় না। অবিশ্যি পদ্মা পম্পারা কেউ যে গরীব একথা মায়ার তখন একবার-ও মনে হয় নি। কি মোটা মোটা রূপোর বালা পরত ওরা। চন্দ্রমায়ার কানের ওপর-নিচ ফুঁড়ে কি সুন্দর কাঁচা সোনার মাকড়ি পরা ছিল, নাকি ওর ঠাকুমার জিনিস। মায়াদের এক কুচি সোনা বা রুপো ছিল না। দশেরার সময়ে একবার লুকিয়ে মায়া পম্পাদের বাড়ি গিয়ে পায়া লাগানো ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে লস্যি খেয়ে এসেছিল। নিজেদের বাড়িতে তো এক কণা কাঁসা বা পিতল ছিল না। সব চীনেমাটি আর পুরনো এলুমিনিয়ম, স্কুলের বোর্ডিং-এর মেট্রন মিসেস অ্যাবটের দয়ায় পাওয়া। লোকটি খুব দয়ালু ছিলেন। মা তাই কত কৃতজ্ঞ। মনে পড়তেই বুকের মধ্যে একটা পুরনো জ্বলুনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

মায়া চোখ ফিরিয়ে দেখল জনি কখন বইয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর ব্রেকফাস্টের বাসন তখনো পড়ে রয়েছে, কারিকুরি করা কাঠের ট্রেতে লেসের ঢাকনি পাতা তাতে সোনালি পাড় দেওয়া মিহি চীনেমাটির বাসন। জানলার বাইরে বরফের পাহাড়ের সারি। চিমনিতে লোহার আংটায় কাঠ কয়লা জ্বলছে, তার আঁচে ঘরটি গরম হয়ে আছে। মায়ার মার সেই ছোটো ছোট ঘর গরম করতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হত।

আটটা বেজে গেছিল। জনির গায়ের ওপর সূক্ষ্ম হাতের কাজ করা সুন্দর রেশমের পুরনো লেপটা টেনে দিয়ে, হ্যাণ্ডব্যাগটি হাতে নিয়ে মায়া উঠে দাঁড়াল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চুল ছাঁটা স্ল্যাকস পরা অচেনা মেয়েটিও উঠে দাঁড়াল। অন্য সাজ পরলেই কি অচেনা হয়ে যায়? চেনার জগৎ শিরা ধরে নাড়ি ধরে টানাটানি করতে থাকে না?

এর আগে কখনো মায়া এ-বাড়িতে ঢোকেনি। ফটকের সামনে

দিয়ে যেতে দেখত কাঠের ফলকে সাদা হরফে লেখা 'দি রেড হাউস', সবাই বলত লাল কুঠি। ঐ ফটক দিয়ে গরীব মানুষরা ঢুকত না। তাদের জন্য আরো দুটো গেট ছিল। 'গোয়েন' বলত নাকি কোনো 'নেটিভ' কখনো বড় গেট পার হয় নি। রাজা মহারাজারা ছাড়া। তাদের তো আর ঠিক 'নেটিভ' বলা যায় না। তারা ইয়োরোপে বেড়াতে যেত। গোয়েনরাও নাকি ইয়োরোপীয়ান, পর্তুগেলে বাড়ি, এদেশে ওদের জেমিন্দারি, এটা কিছু ওদের বাড়ি নয়। সবাই ওদের বিষয়ে নানা কথা বলত।

আসলে এখানকার জীবনযাত্রা চলত ঐ লাল বাড়িটাকে ঘিরে। সরকারী খরচে স্কুল চলত। মায়ার এই দোতলার ঘর থেকে তার চিমনির ডগাগুলো দেখা যায়। ছেলেদের স্কুল, আর একটু দূরে মেয়েদের স্কুল। নাকি নেটিভদের আগে নেওয়া হত না। তখন স্কুলটার একটা আভিজাত্য ছিল। আজকাল ইণ্ডিয়া স্বাধীন হওয়াতে আর ভাল কিছু বাকি রইল না। এই সব বলে দুঃখ করত গোয়েন। অথচ স্কুলের ছাদে বড় বড় করে লেখা ছিল 'বয়েজ হোম' আর 'গার্লস হোম'। মা বলত নাকি আসলে অনাথাশ্রম। ঐ সব ফ্যাশানেবল ছেলেমেয়েরা আসলে কেউ নয়, তবে হ্যাঁ ওদের জন্য সরকার এখনো অনেক টাকা খরচ করে। শুনলে মেয়েরা নিশ্চয় চটে যেত। তবে শুনবে কোত্থেকে, মাকে তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য করত না। শেষ পর্যন্ত মা শাড়ি পরত। মা চাকরদের কাজ করত ঐ স্কুলে। রোজ সকালে আটটা না বাজতে গেট দিয়ে ঢুকে সোজা মিসেস অ্যাবটের কাজের ঘরে গিয়ে ছুঁচ সুতো সেলাইকল নিয়ে বসে পড়ত।

অবিশ্যি মার ঐ অনাথাশ্রম কথাটা একেবারে ঠিক নয়, কারণ কাছাকাছি চা-বাগানের মালিকদের ছেলেমেয়েরাও ঐ স্কুলে পড়ত, যেমন গোয়েন। গোয়েন বলত ইচ্ছা করলেই আমার গ্র্যাণ্ডমাদার এই স্কুল দুটোকে কিনে টিচারদের সবাইকে চাকর বানিয়ে রাখতে

পারে, তা জান ? এখানকার গির্জাটা তো গ্র্যাণ্ডমাদারের বাবার টাকায় তৈরি, গ্র্যাণ্ডমাদারের খরচে চলে। এই গোটা পাহাড়ের ঢালটাই আমার গ্র্যাণ্ডমাদারের সম্পত্তি। চোর-কলের মতো বড় বড় মুক্তো পরে গ্র্যাণ্ডমাদার রোজ ডিনার খেতে বসে। গ্র্যাণ্ডমাদারের হীরে দেখলে চোখ ঝলসে যাবে তোমাদের। সব একদিন আমি পাব।

শুনে বন্ধুরা অবাক। 'সে কি, সব তুমি পাবে কেন ? তোমার দিদিমার ছেলেরা আছে না ? তাদের ছেলেমেয়েরা আছে না ?'

তাতে গোয়েন হেসেই কুটোপাটি। 'ওমা, তাও জান না আমাদের বংশের পুরুষমানুষরা বেশি দিন বাঁচে না। আমার বাবাকে কেউ চোখে দেখেছে ? আমার আঙ্কল বলে কেউ আছে বলে কখনো শুনেছ ? বিয়ে করে নিয়ে আসে বটে আন্টিরা, কিন্তু সব নিখোঁজ হয়ে যায়।'

'নিখোঁজ হয়ে যায় ? মরে যায় নাকি ?' 'তা যেতে পারে, বলা যায় না। মোট কথা তাদের আর চোখে দেখা যায় না।' বলে ফিক্ করে হেসে গোয়েন বলেছিল, 'তবে আসল কথা হল টাকাকড়ি হীরে মুক্তোগুলো নিখোঁজ হয় না। আমার গ্র্যাণ্ডমাদার প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব রাখে।' ভারি গাঁজাখুরি কথা বলত গোয়েন।

মায়া ভাবত পুরুষরা নিখোঁজ হয়, মেয়েরা কেউ কাজকর্ম করে না, শুধু বড়-মানুষি করে তবে কোত্থেকে আসে এত টাকা ? গোয়েনকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করত, 'হেয়ার ড্রেসিং' ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে। গোয়েন অনিশ্চিতভাবে পাহাড়ের গা দেখিয়ে দিত, 'কেন আমাদের চা-বাগান আছে না, নিচে আঙ্গুরের চাষ আছে না ?'

অবাক হয়ে মেয়েরা বলত, 'ওমা' চা-বাগান তোমাদের হতে পারে, কিন্তু, বাকি সবতো মিঃ ফ্রান্সিস্কোর। ঝপ করে উঠে পড়ত গোয়েন 'ঐ একই কথা।' ওটা আবার একটা মানুষ নাকি।

আসলে সবই আমাদের। আমার গ্রেট-গ্র্যাণ্ডফাদারের বাবার টাকা দিয়ে কেনা। এদের বাড়ির বড়মানুষির গল্প মায়ার সমস্ত কৈশোরটাকে রঙীন করে রেখেছিল। এতটুকু হিংসা বা লোভ হয়নি কোনো দিন। সুদূরপরাহতকে কি কারো লোভ হয় নাকি? বরং লোভ হত মেয়েদের পরনে কালচে নীল লম্বা হাতা কার্ডিগ্যানে, গরম মোজায়, খানা-কামরার কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়াতে। দিতেনও মিসেস অ্যাবট যথেষ্ট, মা সূক্ষ্ম সেলাই দিয়ে রিপু করে নতুনের মতো বানিয়ে দিত। সত্যি মেম বড় ভালো ছিল। নাকি আসলে মেম নয়, খৃশ্চান হয়ে মেম হয়েছিল। পম্পাদের কাছে শোনা।

উঃ, মা মরার আগের রাতটা কি ভয়ঙ্কর। কোনো দিনও ভুলবে না মায়া। মা ধুঁকতে ধুঁকতে বলেছিল, 'মিসেস অ্যাবটকে ছাড়িস না; ও আমার মায়ের পেটের বোন। দুষ্টু লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মা-বাবা নেয় নি, কিন্তু পাদ্রীরা নিয়েছিল। হবে না কেন খৃশ্চান? তোর বাপ মলে ও-ই না আমাকে এখানে আনল। খৃশ্চান হলাম না বলে এর বেশি করতে পারে নি। ও তোর মাসি। ওকে ছাড়িস নে। আমার হয়ে এল। হয়তো প্রলাপ বকছিল, মিসেস অ্যাবট তো কখনো কিছু বলেন নি। তবে মায়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

সত্যি সত্যি বড্ড টপ করে মরে গেছিল মা। তখন শীতকাল, স্কুল বন্ধ। কে আবার মাকে দাহ করবে? গোরস্থানের বাইরে মাকে মাটি দিয়েছিল মিসেস অ্যাবট। মায়া কবরের পাশে একটা ফিকে বেগনি উইস্টিরিয়া লতা লাগিয়েছিল। এক বছরে সেটি ফুলে ফুলে ভরে গেছিল। একবার গিয়ে দেখে আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত ঐ মাসি ত্যাগ করলেও মরা মা তো আর তাকে ফেলতে পারবে না। মাসিই কি আর এত দিন আছে। কিন্তু থাকবে না-ই বা কেন, বয়স তো বড় জোর পঁয়ষট্টি হবে।

বাটলার এসে বলল 'বড়-মেম ডেকেছেন।' বড়-মেম। তখন

শহরশুদ্ধ সবাই বলত, 'ব্ল্যাক উইডো', হয়তো ওঁর নেটিভ বিদ্বেষকে বিদ্রূপ করে, কিম্বা অন্য কারণে। এখনো হয়তো বলে। তবে স্থানীয় অবস্থাপন্ন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাসিন্দারা সবাই স্বাধীনতার পর এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ঐ নিয়ে মন্তব্য করবার লোকই বা কোথায়? আর 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সার কথা এখানে জানেই বা কে! সবাই গেছে, কিন্তু বড় মেম কেন থেকে গেল? রহস্যের মূল তো সেইখানেই এবং সেই জন্যই মায়ার এতদিন পরে এখানে আসা। কে জানত জায়গাটা ওর জন্য এতদিন অপেক্ষা করে রয়েছে। একতলার একটা পূর্বমুখী বড় ঘর। মায়ার দেখা এ-বাড়ির নকসায় ঠিক যেমন আঁকা ছিল। ঘর ভরা রোদ; মেঝেতে ঘাসের মতো পাটাকিলে রংয়ের গালচে, দেয়ালে পুরনো চীনে বাসন ঝোলানো, ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে ঝুলছে স্ফটিকের ঝাড়বাতি। খোলা জানলা, হলুদ পরদা সরানো সেই দিকে পাশ ফিরে বড়মেম প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে, সিংহাসনের মতো উঁচু পিঠ দেওয়া চেয়ারে বসে আছেন। এ ঘরের পাশেই বিশাল বৈঠকখানা।

আশী বছর বয়স। তিনি যে এত সুন্দরী মায়া সে-কথা ভুলেই গেছিল। কি ফরসা রং লালচে চুলে একটুও পাক ধরেনি, সবুজ চোখ ফিরোজার মতো; কুড়ি বছর আগে স্কুলের বার্ষিক সম্মেলনে একবার যেমন দেখেছিল তেমনি উজ্জ্বল, যেন নীল-সবুজ আলো ঠিকরোচ্ছে। কালো মানুষ এ মেয়ের ভালো লাগবেই বা কেন। গালচের ওপর পায়ের শব্দ হল না। বড়-মেম প্রবেশদ্বারের দিকে চেয়ে বললেন, 'কাছে এসো, তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, আমি দেখতে পাই না।'

এ-সবই জানত মায়া, তবু ঐ অপরূপ মুখ থেকে অমন কথা শুনে শিউরে উঠল। চমকালে নাকি? আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।' মায়া তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বড়-মেম ওর গায়ে মাথায় হাত

বুলিয়ে বললেন, বস, সামনের ঐ ছোট কালো চেয়ারে বস, আরাম পাবে। ব্রেকফাস্ট খেয়েছ?'

মায়া এত সকালে ব্রেকফাস্ট পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। বড়-মেম বললেন. 'ষাট বছর আগে ঘড়িতে চাবি দিয়ে দিয়েছিলাম. এখনো তাই চলছে। চাবি ফুরিয়ে গেলে কি হবে জানি না। হয়তো বাঁশগাছে ফুল ফুটবে। জান তো ফুল ফুটলে বাঁশ বাঁচে না।' বলেই কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন. 'দেশটাতো উচ্ছন্নে গেল, তাই আমার শেষ কাজটা এবার করতে হয়। আমার স্মৃতিকথা লিখতে পারবে তো; এই দেরাজে ডাইরি. নোট-বই, চিঠিপত্র সব রয়েছে, নির্ভয়ে খুলে দেখতে পাব। একটা বয়সের পর সব মানুষের ব্যক্তিগত গোপন কথা জনসাধারণের সামগ্রী হয়ে যায়। তারিখ দেখে দেখে সব গুছিয়ে নিও; তাছাড়া আমার যেমন যেমন মনে আছে সব বলে যাব। পারবে তো লিখতে? তুমি না সাংবাদিকের কাজ করেছ?'

মায়া জানাল সে পারবে। আর কিছু জানতে চাইলেন না বড়-মেম। এরা আশ্রিতদের আর বেতনভোগীদের নামও জানা দরকার মনে করে না। কিন্তু বড-মেম হঠাৎ বললেন, 'কি বলে ডাকব তোমাকে? চিঠিতে লিখেছিলে এম পাল। এম মানে কি?' মায়া চমকে উঠে বলল, 'মায়া।' 'ও আবার কোন দেশী নাম হল?' মায়া বলল, 'রাশিয়াতে আছে ঐ নাম।' 'হুম, শুনতে মিষ্টি। তাহলে জানলার সামনের বড় ডেস্কের কাগজপত্র নিয়ে কাজ শুরু করে দাও। কিন্তু জনিকে কখন পড়াবে? সকালে তো স্কুলে যায়। কেউ বোধহয় ওর দেখাশুনো করে না। মা-টি তো একটা লক্ষ্মীছাড়ী। ছেলেও নাকি সবাইকে জ্বালাচ্ছে। এ-ঘরে ঢুকতে মানা করেছি। কত কাল আসেনি আমার সামনে। তুমি একটু দেখো. নইলে একটা জন্তু বনে যাবে।'

বড়-মেম উঠে দাঁড়ালেন। পাতলা সুন্দর গড়ন, বয়সের ভারে

একটু নুয়ে পড়েছেন। কানের গলার হাতের হীরেগুলো ঝকঝক করে উঠল। পোশাকটা কুড়ি বছর আগের ফ্যাশানের? কোথা থেকে এসে ওঁর হাতের কাছে আধবুড়ি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আয়া কায়া নিয়ে বলিষ্ঠ একখানি হাত তাঁর কনুইয়ের নিচে রাখল। খুব ফরসা নয়, কিন্তু সে-ও নাকি পর্তুগিজ, গোয়াকে প্রবাসী, শ-তিনেক বছর ধরে।

দরজার কাছে পৌঁছে বড়-মেম থেমে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, অদ্ভুত হেসে বললেন, 'আমার ফুলের বাগান দেখেছ? ফাদার চাওড়ির ছেলেরা সেখানে এই শীতেও গোলাপ ফুল ফোটায়। দেখে এসো সময় পেলে। সকালটা সেখানে কাটাই। দরকার হলে সেখানে যেও। লাঞ্চ খাবে আমার সঙ্গে। ফাদার চাউড়ি একজন অতিথি নিয়ে আসবেন।'

'আর জনি?' 'জনি! জনি দিনের বেলায় স্কুলে আর রাতে প্যান্ট্রিতে খায়। ওর বাপের গায়ের রং কুচকুচে কালো ছিল। মরেটরে গেছে হয়তো এতদিনে। এ বংশের মেয়েদের যারা বিয়ে করে তারা কি বেশি দিন বাঁচে নাকি। জনি কি খানা-কামরায় কেমন করে বসতে হয় জানে নাকি! নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে মিসেস গনজ্বালেজ চলে গেলেন। মায়া বলতে পারল না আজ রবিবার জনির স্কুল নেই, চিন্তিত মনে খাতা পত্র খুঁজতে বসল।

সব দেরাজ টেনে খুলে খুঁজে দেখতে লাগল মায়া। বাস্তবিক পুরনো ডাইরি আর নোটবই, চিঠিপত্র আর হিসাব খাতা ছাড়া কিছু নেই। আর কি যে থাকতে পারে তা ত মায়া ভেবে পেল না। শুনে এসেছিল টাকাকড়ির ভার স্থানীয় হিল ব্যাঙ্কের হাতে। তারা হিসাবপত্র রাখে, ইনকাম ট্যাক্স দেয়, সবাইকে মাইনে দেয়, চা-বাগানের ম্যানেজার থেকে মজুরদের পর্যন্ত। তাদের নাকি ঢাকবার কিছু নেই, কাগজপত্র খুলে ধরে দিয়েছে। মায়ার হাসি পেল। অঙ্ক

বুড়ি, শূন্য বাড়ি, পড়ন্ত অবস্থা, এখানে চোরা-চালানের কি ইঙ্গিত থাকতে পারে ? তবে সে-সব প্রশ্ন ওর করবার কথা নয়। এদিকে ষাট বছরের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা খুব সহজ নয়। এর ভিতরেই কোনো ইঙ্গিত থাকাও বিচিত্র নয়। তারিখ দেখে দেখে মায়া কাগজ সাজাতে বসল।

চোখের সামনে যেন একখানা উপন্যাস তৈরি হতে লাগল। মায়াও তাতে ডুবে যেতে লাগল। ১৯১৫ সালে গনজ্ঞালেজ সাহেবের সঙ্গে বিয়ের পর কর্নিলিয়া যখন এ-বাড়িতে এসেছিলেন এ-বাড়ির গিন্নি তখন কর্নিলিয়ার মা পেট্রনিয়া। এ-বাড়ির জামাইরা আইন মতে শ্বশুরবাড়ির পদবী নিত। প্রথম দিনের ডিনার পার্টির গোলাপী কাগজে সোনালী অক্ষরে লেখা খাদ্য তালিকা পেল মায়া, সে-বছরের হিসাবের খাতায়, ঐ তারিখের খরচের সঙ্গে সুতো দিয়ে সেলাই করা। নাকি ময়ূর রোস্ট খেয়েছিল বাইশজন অতিথি। প্রত্যেককে একটা করে, সোনার জিনিস উপহার দেওয়া হয়েছিল।

১৯১৫ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছিল। সময়টা খুব ভালো ছিল না। ঐটুকু ঐ চা-বাগান। পাহাড়ের গায়ের ফুল-বাগিচা তো সে তুলনায় সে-দিনের, ফাদার চাওড্রির কীর্তি। তাঁকে চিনত মায়া। সত্যিকার কিছু পাদ্রী ছিলেন না। আসলে ডাক্তার বিয়ে-থা করেন নি, গরীবদের ছেলেদের ওষুধপত্র দেওয়াতে, সেবা করাতে, পথ্যের ব্যবস্থাপনাতে, লেখা-পড়া শেখানোতে চাকরি দেওয়াতে এত উৎসাহ, তাই সবাই বলত ফাদার। ফাদার তো ফাদার এখানকার খুদে গির্জার আজকাল প্রধান পৃষ্ঠপোষক ; গনজ্ঞালেজদের তো পড়ন্ত অবস্থা, তারা নিশ্চয় কিছু দেয় না। যদিও এই ঘরের ঐ একটা সত্যিকার স্ফটিকের ঝাড়বাতির দামই হয়তো পঁচিশ হাজার টাকার কম নয়। তাতেই হয়তো গির্জার তিন বছরের খরচ চলে যায়। পাদ্রীকে আর কতটুকু মাইনে দেয়।

পুরনো কথাটায় আবার ফিরে আসতে হল। এতসব দামী

জানিস এরা কিনল কি করে? গোয়েল বলত নাকি ওদের হীরে মানিকের পাহাড় আছে, কোনো লুকনো জায়গায়, ওরা নাকি শুধু ইণ্ডিয়া কেন, ইংল্যাণ্ডটাকেও কিনে ফেলতে পারে। একদিন গোয়েন মালিক হয়ে সব বেচে দিয়ে প্যারিসে গিয়ে থাকবে। এদেশে আজকাল মানুষ থাকে নাকি! কিন্তু মুস্কিল হল যে এমন আইন করেছে যে টাকাকাড় বিদেশে নিয়ে যেতে দেয় না।

মায়ার কানদুটো খাড়া হয়ে উঠল। গোয়েলের ঐ পুরনো কথাতেই তো মিসেস গঞ্জালেজের এ-দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু পুরনো আসবাবে ভরা এই পুরনো বাড়িতে সেরকম ঐশ্বর্যের চিহ্ন কোথায়, যার জন্য তদন্তকারী পাঠাতে হয়? তদন্তকারী···মায়ার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জনি। 'ও মামি! আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আবার চলে গেছ!'

জনির মুখের দিকে তাকাল মায়া। ছয়-সাতের বেশি বয়স হতে পারে না। গায়ের রং ফর্সা বাঙ্গালীর মতো। মুখখানা হয়তো সুন্দর হলেও হতে পারে, কিন্তু এমন ধূলোমাখা মূর্তি মায়া কম দেখেছিল। মায়া হেসে বলল, 'চল, তোমাকে গরম জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিই। তারপর আমার ঘরে তোমার লাঞ্চ দেবে।' মায়া উঠে পড়ল। প্রথম সকালে ঢের কাজ করা গেছে। জনিকে বলল, 'এত রোগা কেন তুমি? চল তোমার ঘরে।' জনির ঘর দেখে কান্না পায়। মস্ত ঘর, মস্ত জোড়া খাট, মস্ত আলমারি, ড্রেসিং টেবিল ঘর জোড়া গালচে পাতা। একটা বইয়ের আলমারিতে জনির যাবতীয় সম্পত্তি কাপড়চোপড়, স্কুলের বই, হকিস্টিক, বল, একটা লোম-ওঠা গলায় ভালুক। এক ঝলক হেসে জনি সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'এই দেখ, আমি যখন ছোট ছিলাম, তুমি আমার বার্থ-ডেতে দিয়েছিলে! ড্যাডি···' জনি যেন ধাঁধায় পড়ে থেমে গেল। মায়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। জনি বলল, 'এখন আর আমার বার্থডে হয় না। আমি বড় হয়ে গেছি।'

মায়া বলল, 'কে বলেছে তুমি বড় হয়ে গেছ। এইতো আমার কোলে কেমন এঁটে যাচ্ছ।'

শেষ পর্যন্ত লাঞ্চটা খাওয়া হয়নি। ফাদার চাওড্রির নাকি কি জরুরী কাজ পড়ে গেছিল। মিসেস গনজালেজ অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন। মস্ত খানা-কামরায় জনি আর মায়া পাশাপাশি বসে মহানন্দে অন্য লোকের জন্য রান্না করা নানা রকম উপাদেয় জিনিস খেয়েছিল। টেবিলে বসে কেমন আচরণ করতে হয়, জনিকে তার প্রথম পাঠ দেওয়া গেল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাবান গরম জল দিয়ে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে দেখাচ্ছিলও অন্য রকম। তার ওপর ভারি রসিক ছেলেটা। তবে ঐ, মায়াকে কিছুতে ছাড়তে চায় না। খালি বলে 'তুমি আমাকে ফেলে চলে যেও না। আমার রাতে ভয় করে।'

'ভয়? কিসের আবার ভয়? এ-বাড়ী এমনি শক্ত করে তৈরী যে বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না।' 'না, তবে দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসে দুষ্টু ছেলেদের ধরতে পারে তো। মেগ বলেছে।'

মায়া চটে গেল। 'মেগ? মেগ আবার কে?' বাটলার কান খাড়া করে শুনছিল, বলল, 'ঐ যে বড়-মেমের সঙ্গে থাকে। জনি-বাবা শোবার সময় দুষ্টুমি করলে ওকে ওই বলে ভয় দেখায়।' মায়া জনিকে বলল, 'শুনলে তো মিছিমিছি বানিয়ে বলে মেগ। দেয়াল থেকে কেউ নেমে আসে না। আজ থেকে তোমার আমার ঘরের মাঝের দরজা খুলে রাখব—বাঁ হাতে কাঁটা ডান হাতে চামচ।'

দুপুরে মেঘ করে বেজায় শীত পড়ল। জনি নতুন বই নিয়ে মায়ার ঘরে আংটার সামনে গালচের ওপর ঘাড় গুঁজে বসে রইল। বড়-মেম নাকি সাড়ে তিনটেয় ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে বসে চা খান। মায়া এই অবকাশে পড়ার ঘর, খাবার ঘর, বসবার ঘর, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। দেখল প্রথম দর্শনে অতটা বুঝতে পারে নি, এ বাড়িটা যদিও এমন সব দামী দামী জিনিস দিয়ে

সাজানো, যা কোটিপতি ছাড়া কেউ কিনতে পারে না, কিন্তু সে সবই অনেক দিন আগে কেনা, যা যেখানে আছে সেখানে দাগ পড়ে গেছে। কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখবার জায়গা আছে বলেও মনে হল না। তবে ওসব হল বিশেষজ্ঞের কাজ এবং সার্চ ওয়ারেন্ট না আনলে ও-সব তদন্ত করাও বে-আইনী।

তিনটের সময় মায়া আবার কাগজপত্র নিয়ে বসল ১৯১৮ সালের ১লা মার্চ কর্নিলিয়া ও সিলভেস্টার গনজালেজের একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। হলদে হয়ে যাওয়া খুদে একটা খবরের কাগজের কাটিং। মেয়ের নাম এমিলিয়া। খাতায় ৮ই মার্চ তারিখের হিসেবের সঙ্গে হ্যামিলটনের বাড়ির একটা বিলের রসিদও ঝুলছিল হীরের লকেট বাবদ চার হাজার টাকা। এ বাড়ির জীবনযাত্রা মনের মধ্যে রূপ ধরতে লাগল, কিন্তু সে সবই খরচের হিসাব ক্ষয় হবার কাহিনী। জমার ইঙ্গিত কোথাও নেই। হয়তো গোয়েন যা বলত তাই সত্যি, বোম্বেটে পূর্বপুরুষদের জমানো টাকায় ওদের বড়মানুষী। তার সঙ্গে ভারত সরকারের কতটুকু সম্বন্ধ। আশী বছরের বুড়ি তার মায়ের সম্পত্তি যখন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল তখনি নিশ্চয় তার মাশুল যা দেবার দিয়েছিল। ব্যাঙ্কের হাতে টাকা-কড়ির ভার, এখনো নিশ্চয়ই ট্যাক্স দেওয়া হয়।

কলকাতায় যেটাকে দুঃসাহসিক অভিযান বলে মনে হয়েছিল, এক দিনেই তার উপর কেমন ঘৃণা ধরে যাচ্ছিল। বাটলারের সঙ্গে জনি এল। বড়-মেম মায়াকে আজকের মতো কাজ বন্ধ করে ওঁর সঙ্গে চা খেয়ে জনিকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলে পাঠিয়েছেন।

জনি বলছিল, আমি প্যাটিসে খাই রোজ। মায়া ওকে ধরে মিসেস গনজলেসের বাগানে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বেতের চেয়ারে বসল। পড়ন্ত রোদে বাগানটা ভরে ছিল, তার এতটুকু উষ্মা ছিল না। বড় মেমের পরনে লোমের কোট; যতো মিঙ্ক, কে জানে মায়ার

তো আর ও-সব চেনার কথা নয়। জনি মায়ার ওপাশে এমন নিঃশব্দে বসেছিল যে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

মিসেস গনজ্যালেজ বললেন, 'জনি এসেছে? গুড আফটারনুন, জনি।' জনি নীচু গলায় বলল, 'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম'। নিজে মায়ের দিদিমাকে ম্যাডাম বলে জনি ঐ রকমই শেখানো হয়েছে। অথচ যদ্দূর মনে হচ্ছিল বাড়িতে নোকর-চাকর ছাড়া এই দুটি মাত্র বাসিন্দা। নিজের রুমাল দিয়ে জনির কপালের ঘাম মুছিয়ে মায়া ওর প্লেটে একটা বড় গোলাপী পেস্ট্রি তুলে দিল। এ-সব জিনিস বাড়ীতে মেগ তৈরী করে, বড়-মেম বললেন। আগে নাকি সে প্যারিসে কেকের দোকানে কাজ করত। বাটলারও কিছু নেটিভ নয়, খাঁটি পর্তুগীজ বংশ বড়লাটের বাড়িতে কিছু দিন কাজ করেছিল। এ-সব শুনে মায়া তো হাঁ।

রোদ পড়ে যায় তাড়াতাড়ি, কাজেই চা সেরেই বেরিয়ে পড়তে হল। কোথায় যাবে বলে দিতে হল না। মায়ার পা দুখানি আপনা থেকেই সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে সেই বড় চেনা পথটি ধরল। জনি সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চলল। 'একটা কুকুর বাচ্চা থাকলে বেশ হত না মামি?' 'নেই বুঝি তোমার?' 'না ম্যাডাম দেবে না। বলে জন্তু জানোয়ার বড্ডো নোংরা।'

মাথার ওপর দিয়ে তীরের ফলার আকারে বুনো হাঁসের পাল দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের দিকে দেখিয়ে জনি জিজ্ঞাসা করল, ওরা নোংরা?

কিন্তু মায়ার মুখে কথা নেই। মেয়েদের বোর্ডিং-এর পিছনে কে জানে কবে ধস নেমেছিল। মিসেস অ্যাবটের ছোট বাড়ির এবং তার গায়ে লাগা আরেকটি আরো ছোট বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। পুরনো ধস, জনির সে-বিষয়ে জানবার কথা নয়। ধড়াস করে উঠেছিল বুকটা, তারপরেই মনে হল এই ভালো, যা গেছে তা একেবারে যাক্‌গে। সেই ছোট ছেলেটার স্মৃতিও যেন মনের মধ্যে

কেমন কোমল হয়ে এল। বোর্ডিং-এ থাকতে চায় নি সে জোর করে মায়া তাকে রেখে এসেছিল, নইলে মায়া সারা দিন কাজে ব্যস্ত, কে তাকে আগলাবে। শেষ মুহূর্তে ছুটে এসেছিল মায়া তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে বলেছিল, তুমি এসেছ, মা? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? যাক সব বাঁধন, পায়ের বেড়ি খসে পড়ুক।

জনি ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল ফাদারের আপেল বাগানে গেলে ওরা আপেল দেয়।

কেন বাড়িতে তুমি আপেল খাও না?

খাই মামি, কিন্তু এগুলো গাছে হয়।

মায়া অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পাহাড়ের মাথা থেকে নীচের উপত্যকা পর্যন্ত ধাপে ধাপে ফলের গাছ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আগে এ-সব কিছু ছিল না, শুধু সরু সরু বাঁশের ঝাড় ঝোপঝাপ পাথর। আশ্চর্য মানুষ ফাদার চাওড়ি, দেশ কোথায় কেউ জানে না, নাকি আসলে ডাক্তার। পাহাড়ে পাহাড়ে ওষুধ দিয়ে বেড়ায়। মায়ার মাকেও কত ওষুধ দিয়েছে আর সে-ই কিনা এক পাল বেকার ছোকরার সাহায্যে ন্যাড়া পাহাড়ে এত ফল ফলিয়েছে। থাকেও না সব সময়, তিন মাস রইল তো চার মাস ট্যুরে।

মা বলত নাকি বাঙ্গালী কলকাতায় ডাক্তারী করত, কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে ঘরবাড়ি ছাড়া। মনে হল এই তো বেশ আছে সংসার করলে এর চাইতে ভালো কি করতে পারত? সংসারে বিশ্বাস নেই মায়ার। ঐ তো মিসেস অ্যাবট কেমন উদয়াস্ত কাজ করতেন মেশিনের মতো, চালাতেন দুটো বোর্ডিং। মার কথাই যদি সত্যি হয়—তখন বিশ্বাস হত না, এখন মনে হল সত্যি হতেও পারে —তবে মাসির সংসার ভাঙ্গার ফল তো ভালো হয়েছিল নইলে চুঁচড়োয় সেই গোঁড়া হিন্দু বাড়িতে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরেই না ওর জীবন কাটত! মা নিজেও কম কষ্ট পায় নি! বাবা মলে নাকি লাঞ্ছনা সইতে না পেরে দিদিকে লুকিয়ে চিঠি লিখেছিল। অমনি

মিসেস অ্যাবট নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়া করে মাকে নিয়ে এসেছিলেন। মায়াকে কোলে নিয়ে এক কাপড়ে মা এসে এখানে উঠেছিল। আর কারো দয়া চাইতে হয় নি।

একবার শীতের ছুটিতে মিসেস অ্যাবটের সঙ্গে ওরা কোন্নগরে পাদ্রীদের আশ্রমে গিয়েছিল। মা একদিন সরু একটা গলিতে মস্ত এক বাড়ি দেখিয়ে বলেছিল ঐ নাকি মায়ার ঠাকুরদার বাড়ি ঐখানে বাবা চোখ বুজেছিল। বাবা মরাতে মনে হয় জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছিল মা শাপে বর হয়েছিল। কাজ চালাবার মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজি শিখেছিল মা। মায়ার সঙ্গে সর্বদা বাংলাতেই কথা বলত, মায়াকে বাংলা লিখতে-পড়তে শিখিয়েছিল। কিন্তু মিসেস অ্যাবটের মুখে ইংরিজি ছাড়া কিছু শোনা যেত না— গোপনে মার সঙ্গে হয়তো বাংলা বলতেন— কিন্তু সাটিন পরতেন, ফরসা রং রুক্ষ লালচে চুল বড়দিনের পার্টিতে সকলের সঙ্গে খ্রিস্টমাস ট্রির চারদিকে বড়দিনের গান গেয়ে নাচতেন।

ডনি খানিকটা ছুটোছুটি করে ফিরে এসে বলল ডেভ মামাদের এখানে পোঁতা হয়। হাঁটতে হাঁটতে ওরা গীর্জার কাছে পৌঁছে গেছিল। গির্জার পাশে সমাধিক্ষেত্র, সেখানকার গাছপালার কত যত্ন, সারি সারি কবরের মাঝখানে নুড়ি বিছানো সরু পথ। আর সমাধিক্ষেত্রের দেয়ালে বাইরের পোড়ো জমিতে এক জায়গায় ঝরনার জলের মতো উইস্টিরিয়া লতা ডাল-পালা ছড়িয়ে আছে। এত শীতেও তাতে চীনে লণ্ঠনের মতো থোপা থোপা বেগনী ফুল ঝুলে আছে। নিজের হাতে পোঁতা লতাগাছের বাহার দেখে মায়ার গলা টনটন করে উঠল। যাদের দেখাশুনোর কেউ থাকে না তারা কিসের জোরে এত সুন্দর হয়?

ডনি বলল, 'রাতে কবর খুলে ওরা উঠে দুষ্টু ছেলেদের খোঁজে জান মামি।' মায়া ওর হাত ধরে বলল, 'মোটেই খোঁজে না সব বাজে কথা।'

রাতে খাবার পর মিসেস গনজালেজ মায়ার প্রথম দিনের কাজের কথা শুনে মহা খুশী। তার পরের বছর হার্মিয়োনি জন্মেছিল! ভারি সুন্দরী দুই মেয়ে আমার। মোটা বইতে লিখে নাও যার যেখানে জমি মাপা থাকে সে সেইখানে মাটি নেয়। কার্নিলিয়া আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, হার্মিয়োনি আছে প্যারিসে। কেন যে কবে ইয়োরোপের লোকেরা এদেশে? হার্মিয়োনির মেয়ে গায়েনও প্যারিসে বিউটি পার্লার খুলেছে শুনি নাকি মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে। শুধু বিউটি পার্লার করে কি না কে জানে যা চালাক ঐ মেয়ে। একটু থেমে বললেন, 'সব লিখে নিচ্ছ তো? ঐ গায়েন হল জনির মা। আর জনির বাবা একজন নেটিভ কুচকুচে কালো। নাকি বৈজ্ঞানিক, ইণ্ডিয়ান বৈজ্ঞানিক শুনলে আমার হাসি পায়! আগে এসব লোককে আমরা 'বাবু' বলতাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। তবে খুব ভালো হিসাব কষতে পারত। এখন শুনি শিমলায় ঐ রাজবাড়িতেও নাকি নেটিভদের আড্ডা। কি বাড়ি কি বাগান! নিচে রূপোর সুতোর মতো কি একটা নদী দেখা যায়। এতদিনে দিয়েছে বোধ হয় সব নষ্ট করে—যা বলছি সব লিখে নাও মায়া—একজন দেশপ্রেমিক পর্তুগীজ মেয়ের মনের কথা।

বুড়ির চোখে ঘুম ছিল না। তার কথা শুনে শুনে মায়া স্তম্ভিত। কোনো দিনও তিনি বোধ হয় এই মাটির পৃথিবীতে বাস করেননি। কিন্তু তাঁর অনর্গল বকুনির মধ্যে যে কথা শুনতে মায়ার এখানে আগমন তার এতটুকু হদিশ পাওয়া যায়নি। দশটার সময় যেই মিসেস গনজালেজ হঠাৎ কথা বন্ধ করে সদ্য ঘুম থেকে জাগার মতো করে অপরূপ দৃষ্টি দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকালেন অমনি দরজার ছায়ার পিছন থেকে নিঃশব্দ চরণে তাঁর চির-সঙ্গিনী মেগ এসে কনুইয়ের নিচে হাত রাখল। হয়তো মাইনেভুক্তদের হাত ধরা তিনি পছন্দ করলেন না। মেগের দিকে

চেয়ে হঠাৎ মায়ার মনে হল ঐখানে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতেও পারে।

যাবার আগে ঘরের বড় তেলের বাতি নিভিয়ে দিল মেগ। টর্চের সাহায্যে যে যার শোবার ঘরে গেল। ফল-বাগানের কর্তৃপক্ষ নিজেদের জন্য বিজলি তৈরি করে বাড়তি বিদ্যুৎ স্কুলবাড়ি লালকুঠি আর কাছাকাছি গোটা চারেক চাবাগানে দিয়ে থাকে। রাত নয়টায় ওদের মেসিন বন্ধ হয় তখন টর্চ আর তেলের বাতি। এসব হালের ব্যবস্থা। আগে সবাই তেলের বাতিই জ্বালাত কিম্বা মোটা মোটা মোমবাতি। গির্জায় একসঙ্গে মানুষের সমান উঁচু দশটা মোমবাতি জ্বলত।

রাত দশটায় এখানে মাঝরাত। ঘরে এসে জানলার মোটা লাল কম্বলের পরদা সরিয়ে মায়া দেখল পাহাড়ের ঢাল ঘুটঘুটে অন্ধকার শুধু চাবাগানে মিটমিট করে দু-তিনটে আলো জ্বলছে। কোথায় একটা শীত লাগা কুকুর ডাকছে। পাশের ঘরে লেপ গায়ে দিয়ে মস্ত বড় জোড়া খাটে একলা ছোট্ট জনি ঘুমিয়ে কাদা। দু ঘরের মাঝে দরজার পাশে লাল ঘেরাটোপ দেওয়া ছোট্ট একটা রাতের বাতি জ্বলছে। মায়ার বুকটা হু-হু করে উঠল।

শুয়ে শুয়ে মনে পড়ল ঐ স্কুল দুটি বড় ভালো। কেমন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয় মানুষকে তাই শিখিয়ে দেয়। মেয়েদের যেই পনেরো বছর বয়স হয় সবাইকে একটা না একটা ব্যবসা শেখানো হয়। যার যেমন পছন্দ। হেয়ার ড্রেসিং, বিউটি কালচার, দরজির কাজ, ক্যানটিনের কাজ, লণ্ড্রির কাজ, স্টেনোগ্রাফি আর টাইপ করা. যাদের পড়াশুনোয় মন তারা এখান থেকে পাস করে অন্য জায়গায় কলেজে পড়তে যায়। একা দাঁড়াবার পাঠ দিয়ে দেয় এরা। আর মেয়েগুলোর মন খালি কেমন সাজেব কে দেখবে কাকে বিয়ে করবে সেই দিকে। আছেই বা কে পাহাড়ের এই ছোট্ট শহরে? এক ঐ ছেলেদের স্কুলের কচি কচি দাড়ি-গজানো

বড় ছেলেগুলো। সাহসী মেয়েরা তাদেরি লম্বা লম্বা প্রেমপত্র লিখে হাত পাকাত। বোর্ডিং-এর আয়ারা চিঠি চালাচালি করত সামান্য কিছু হয়তো হাতে পেত আর অনেকখানি রস।

ঝড়ের মুখে কুটোর মতো সেই সব মেয়ে কোথায় উড়ে পড়েছে কে জানে। তাদের একজনের সঙ্গেও মায়ার যোগাযোগ নেই। কারো সঙ্গে তার স্নেহের বন্ধন গড়ে ওঠেনি। মা? মার সারাক্ষণ শরীর খারাপ, খালি খিটখিট করত। মিসেস অ্যাবট বড় দয়ালু ছিলেন কিন্তু মায়ার সঙ্গে কথাই বলতেন না। মা মারা গেলে ওকে বোর্ডিং-এ ফ্রিতে ভরতি হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও মায়া জানে না। ঐ মেগের নিশ্চয় স্কুলের টিচারদের বাড়িতে যাওয়া-আসা আছে নইলে কার সঙ্গে মেশে ও? ও জানতে পারে? হাই তুলে ভাবে মায়া ভালোবাসা? ভালো-বাসা কাকে বলে? ভালোবাসা আবার কি? শুধু একটা মনের অবস্থা খালি একটা জ্বরের মতো সেরে গেলে তার কিছুই থাকে না। কিছুই থাকে না কি? একটা ছোট রোগা ছেলেও না যে নাকি ছয় বছরও বাঁচে না। ঘুমের ঘোরে টের পায় মায়া কে একটা ছোট ছেলে খচমচ করে ওর খাটে উঠে লেপের নিচে সেঁদিয়ে রোগা রোগা দুই হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে—অমনি কোথায় একটা ফাঁকা ভরে যায়। মায়া ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মায়া চেয়ে দেখে পাশের ঘরে জনি নিজেই কাপড়চোপড় পরে তৈরি হচ্ছে। ওকে দেখেই একগাল হেসে বলে 'আমি স্কুলে যাচ্ছি, মামি, তুমি কিন্তু চলে যেও না।' মায়া মাথা নেড়ে বলে, 'না যাব না।' 'কখন ফিরবে?' 'তিনটের সময়।' 'কার সঙ্গে যাচ্ছ?'

'ডি সুজা রোজ আমাকে ব্রেকফাস্ট দেয়; স্কুলে পৌঁছে দেয়। কিন্তু বলে নাকি বুড়ো হয়েছে তাই ওর পা ব্যথা করে।'

আরো পরে সাঁইলা এসে স্নানের জল দিয়ে যায়। বাটলার

নিজে ওর ব্রেকফাস্ট এনে দেয়। বলে, 'হ্যাঁ জনিকে স্কুলের গেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছে। অথচ জনি একলাই পাড়া চষে বেড়ায়। ওর মামিকে খোঁজে। আজ আর যায়নি। মিস সাবকেই মামি ঠাউরেছে। মামির মুখ ভুলে গেছে।"

মায়া জিজ্ঞাসা করল, 'ওর বাবা নেই?'

বাটলার একটু ঘাবড়ে যায় 'না মানে আমি তো কখনো দেখিনি। এখানে তিন বছর আছি, এর মধ্যে কখনো আসেনি। হয়তো মরে গেছে। সার্ভেন্টদের বেশি না জানাই ভালো। এই বলে যেন ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু বলতে পারত নেহাৎ সার্ভেন্ট বলে বলতে পাচ্ছে না এমন একটা মুখ করে মায়ার ট্রে নিয়ে বাটলার চলে গেল। মায়া তার রিপোর্ট লিখতে বসল।

পরে মিসেস গনজ্যালেজের সঙ্গে সকালের সেশন শেষ করে ঐ রিপোর্ট নিয়ে স্থানীয় ছোট্ট ডাকঘরে গিয়েছিল। ঐ তার প্রথম ভুল। এখানকার ডাকঘরের কর্মীরা এখানকার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। চিঠি ওজন করে টিকিট দিতে দিতে ওর দিকে চেয়ে কালো উঁচু দাঁত মেম বলল, 'তোমাকে না কোথায় দেখেছি?' মায়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। হেসে বলল 'কোথায়? আমি তো কাল ক্যালকাটা থেকে এসেছি।' মেম ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কি জানি খুব চেনা মনে হচ্ছিল। আমারি ভুল হবে।' কোনো মতে কাজ সেরে মায়া ফিরে এল। খামের ওপর ঠিকানা দেখে মেম কি ভাববে? কি আবার ভাববে বললেই হবে আমার ফ্রেণ্ড ঐখানে কাজ করে।' এদের তো সবার দুটো-একটা ফ্রেণ্ড থাকে। কিন্তু যদি জানাজানি হয়ে যায়, যদি বড়-মেম ওকে ছুটি দিয়ে দেয়, তাহলে জনির কি হবে? অবাক হয়ে যায় মায়া, এক গঙ্গা দুঃখ পার হয়ে এসেও কিনা বুকের মধ্যে ছোট পাখি কাঁদে। কিন্তু জনির জন্য ভাবলে চলবে কেন এখানকার কাজ তো বড়জোর দুমাসের। ততদিনে তদন্ত নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে, মায়ার এখানে থাকবার কোনো কারণ

থাকবে না। ভাবে মায়া তাহলে ওর মা-বাবার খোঁজ নিতে হয় নিদেন ওকে কোনো ভালো বোর্ডিং-এ রাখতে হয়। মিসেস গনজ্যালেজের কাছে কথাটা পাড়তে হবে। বলতে হবে ও ছেলে ভালো করে মানুষ না হলে গনজ্যালেজ নামের অসম্মান হবে না?

অনেক বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ফেলল মায়া। ছোট মেয়ে জন্মাবার এক বছর পরে ডাইরিতে লেখা 'বাবার মতো সিলভেস্টারও চলে গেল। যাক গনজ্যালেজদের কোনো অবলম্বন দরকার হয় না। টাকাকড়ি তো আর নিয়ে যায় নি।' ব্যস ঐ পর্যন্ত এরপর আর কোথাও সিলভেস্টারের উল্লেখ নেই। মায়া শিউরে উঠল. সাধে কি ওকে ব্ল্যাক উইডো বলত লোকে। 'কিন্তু অমন সুন্দরী ধনী স্ত্রীকে ছেড়ে গেলই বা কেন সে?'

সতেরো বছর আগেকার কথা মনে করবার চেষ্টা করল মায়া। স্কুলের মেয়েরা বলত নাকি স্ত্রীর মেজাজ সইতে না পেরে দেদার টাকাকড়ি হীরেমোতি নিয়ে একেবারে সাউথ অ্যামেরিকা চলে গেছে সিলভেস্টার। সেখানে নাকি তার মস্ত ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার কারবার। তার নাকি সোনার সংসার সুন্দর ছেলেমেয়ে!

মিসেস গনজ্যালেজের মেয়েরা ইংল্যাণ্ডে লেখাপড়া শিখেছিল। ডাইরিতে তাদের কথা আর কিছু নেই। মায়া পাশে টিক দিয়ে রাখল, যাতে তাদের বিয়ে জানতে হবে। ভাবতে লাগল মানুষ কেন ডাইরি রাখে? দুখের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য? সুখের কথা কি মনে করিয়ে দেবার দরকার থাকে? নাকি দুঃখের কথা? মিসেস গনজ্যালেজের ডাইরি সুখদুঃখবর্জিত ঐশ্বর্যের ইতিহাস। কিন্তু আসল রহস্যটিই বাদ পড়ে গেছে ঐ ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়। মেয়েদের প্রত্যেক জন্মদিনে হীরের গয়নার হিসাব আছে। দশ আর এগারো বছর বয়স হলে পর বিলেতের বোর্ডিং-এর খরচের হিসাব আছে। ছুটিতে মনে হল এদেশে আসত। তারপর দশ বছরের হিসাব বাদ দিয়ে একেবারে গোয়েনের কথা।

অবাক হয়ে ভাবে মায়া কি চায় মেয়েরা সংসারের কাছ থেকে ? সুখী হতে চায় ? কি করে সুখী হতে হয় ? ছোট বেলায় মনে পড়ে পম্পা পদ্মারা নিজেদের বেকার মাতাল স্বামীদের গালি দিত, বলত 'এখন খুব সুখে আছি। স্কুল থেকে ঘর পাচ্ছি, রসদ পাচ্ছি, কেমন কাপড় কিনছি, গয়না গড়াচ্ছি।'

মিসেস অ্যাবটের বাড়ির মৌসুমী ফুলের বাগানে জল দিতে দিতে মায়া জিজ্ঞাসা করেছিল 'নিজেদের বাড়ি নেই তোমাদের ? ছেলেপিলে নেই ?' 'এইতো আমাদের বাড়ি আবার বাড়ির কি দরকার ? কেমন সারাতে হয় না, ট্যাকসো দিতে হয় না। আর ছেলেপুলে মানেই শুধু ঝামেলা। আমার গুলোকে বোধ হয় ওদের ঠাকুমা দেখে। পম্পার তো হলই না কিছু।' তবু সুখী ছিল না ওরা; সুপুরুষ স্বজাতি দেখলেই কান খাড়া করত। পম্পা মাদুলী নিয়েছিল, লামাদের কাছ থেকে হাত দেখাত।

মিসেস অ্যাবটই কি খুব সুখী ছিলেন ? মা মারা গেলে পর তবে মায়ার সঙ্গে গল্প করতেন ছুটির দিনে ডেকে পাঠিয়ে, লম্বা শীতের ছুটিতে। সন্ধ্যে হতেই খাওয়া-দাওয়া চুকে যেত, তারপর তাঁর ছোট বসবার ঘরের গনগনে আগুনের সামনে বসে উল বুনতেন। মায়াও তাঁর হাতে পড়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। 'জওয়ান'-দের জন্য খাঁকি উলের সোয়েটার টুপি, কম্ফটার। বলতেন সারাক্ষণ খাটবে মায়া তাহলে আর আক্ষেপ করার সময় থাকবে না। দেখ না থাকাই মানে সুখ। শুধু নিজের জন্য কাজ করে কি কেউ সুখী হয় ? অন্য লোকের জন্যও করতে হয়। তারা যত অচেনা হয় ততই ভালো। তাহলে তাদের কাছ থেকে কেউ কিছু প্রতিদান আশা করে না। কিছু আশা না করলেই কেউ দুঃখও পায় না।

কাঁটা চালাতে চালাতে আড়চোখে মুখ দেখত মায়া। মোটা-সোটা ফরসা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান আধা-বয়সী মহিলা; সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে পায়ের কব্জি দুটো ফোলা-ফোলা। লোমের জুতো

খুলে আগুনের দিকে পা মেলে দিয়ে বকে যেতেন মিসেস অ্যাবট। মায়া শুধু হাঁ হুঁ করে যেত হয়তো দুটো একটা প্রশ্ন করত। এই নাকি তার নিজের মাসি। যাকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা রক্ষা করতে পারেনি। পরে পুলিশে উদ্ধার করে এনে দিলে নেয়নি ওরা। নিজের মা-বাপও নেয়নি। তাহলে নাকি ছোট বোনের বিয়ে হত না। ছোট বোন মানে মায়ার মা।

উদাস নয়নে হিমালয়ের দিকে চেয়ে মায়া ভাবে—তা না হয় বিয়ে নাই হত। তাতে কিই বা কার এসে যেত। কতই বা সুখ পেয়েছিল বিয়ে করে মা। বাবা নাকি কাজকর্ম করত না মদ খেত। হ্যাঁ অবিশ্যি তা হলে মায়াও জন্মাত না। তাতেই বা কার কি এসে যেত? মায়া না জন্মালে কার কি ক্ষতি হত? এই তো ম্যাস এও কখনো বলে না 'মায়া আমি তোর মাসি আয় কাছে এসে বোস।' ওঁর নাকি দুটো ছেলেমেয়ে ছিল। মুখের ওপর ওরা দোর বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই শুনে বুড়ো পাদ্রী ওঁকে নিয়ে গিয়ে মিশনে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন. মা বলত, সেই যে গাউন পরল ইংরিজি বুলি শিখল আর কখনো ছাড়ল না। কেনই বা ছাড়বে। এখানে কেমন সুখে সম্মানে আছে। আমাদের কেমন সুখে রেখেছে। বলে সব নাকি যীশুর দয়া। তা হতেও পারে। ঠাকুর-দেবতারা কি করেছে ওর জন্য!'

যীশু সুখে রেখেছে? সুখ আবার কি? দুঃখ দেবার লোক না থাকাই কি সুখ? মায়া যীশুকে মানে না।

মেগ এসে বলে, 'ম্যাডামের শরীর ভালো নেই, মিস পল এবেলা উঠবেন না। আপনার লাঞ্চ ডি-সুজা ট্রেতে করে এখানে দিয়ে যাবে।'

মায়া উদ্বিগ্ন হয় 'কি হয়েছে মিসেস গনজ্যালেজের?' মেগ করুণ হেসে বলল, 'কি আর হবে? বৃদ্ধ বয়স হয়েছে। ওঁর আশীর ওপরে বয়স হয়েছে; শীতকালে ওঁর মেডিটারেনিয়ানে যাওয়া

অভ্যাস ছিল; এখন আর একনচেঞ্জও পাবেন না। টাকাকড়িও কমে এসেছে যদিও সে কথা মানবেন না—'

মায়া বলল, 'বস না পাঁচ মিনিট মনে হচ্ছে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। সহানুভূতির কথা শুনে মেগ গলে যায়। 'সারা রাত ঘুমোইনি কখন ম্যাডাম কি চেয়ে বসেন। অথচ ওঁর দুই মেয়ে দুই জামাই নাতনি সবাই আছে। বড়দিনে পাঠাবে সব কার্ড দেখবেন। এসে একবার মুখ দেখে যাবে না। নাকি সবাই বড়লোক। জনির মা কার্ডও পাঠায় না। রূপসী বলে ভারি গর্ব। বুড়ি চোখ বুজলে ছেলের কি হবে ভাবেও না।'

মায়া বাধা দিয়ে বলল, 'ওর বাবা নেই?' 'আছে বৈকি। নাকি তার বেশ নাম-ডাক। কালো রং বেঙ্গলী হিন্দু কি আর বলব যার যেমন পছন্দ। ইংল্যাণ্ডে দেখা অমনি ভালোবাসা অমনি বিয়ে। এক বছর বাদে জনি জন্মাল। তারপর কি হল জানি না। এসব আমার সময়ের আগে। কিন্তু তিন বছরের জনিকে নিয়ে এখানে মাটি এল এক বছর রইল তারপর বলা নেই কওয়া নেই ছেলে ফেলে একেবারে কিনা প্যারিস! এ আমার নিজের চোখে দেখা। যেটুকু পারি ওর যত্ন করি; সময়ই পাই না ভারি দুষ্টু হয়ে উঠছে। ভয় দেখিয়ে কাজ করাই।'

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওর বাবার কাছে ওকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।' মেগ হাসল 'এখান থেকে নড়বে নাকি! বলে ওর মামি এখানে ফিরে এসে নাকি ওকে নিয়ে যাবে। আর বাপের তো নামও জানে না। ম্যাডাম জানলেও জানতে পারেন তাই বলে হিন্দু বাপের কাছে গনজ্যালেজদের বংশধরকে কি আর যেতে দেবেন! সবচেয়ে মজা হল মায়ের মুখ ভুলে গেছে আপনাকেই ওর মামি ঠাউরেছে।'

মেগ চলে গেলে মায়া ভাবে আর কি উপায় হতে পারে? বড়-মেম আর কদিনই বা বাঁচবেন? ছেলেটাকে তার বাপ নিয়ে গেলেই

তো ল্যাঠা চুকে যায়। গনজ্যালেজদের বংশধর না আরো কিছু! আর মিসেস গনজ্যালেজও কিছু জনির সাতাকারের অভিভাবক নন।

একা একা ট্রেতে সাজানো সুন্দর বাসনে মায়া লাঞ্চ খেল। একবার গিয়ে সামনের লনে দাঁড়াল বরফের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখল। ভাবল এখানকার লোকরা কি করে সংসারী হবে? এখানে কি ঘটি-বাটি খাট পালঙ্কের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে? মার ছোট্ট বাড়িটি তকতকে পরিষ্কার ছিল কিন্তু দরকারী জিনিস ছাড়া একটি বাড়তি জিনিস ছিল না। মাঝে মাঝে মায়া রান্নাঘর থেকে আনা চাটনির বোতলে জল ভরে তাতে লম্বা এক ছড়া বুনো গোলাপ ডাল-পাতা সুদ্ধ সাজিয়ে জানলার ওপর বসিয়ে রাখত। মনে হত সমস্ত বাড়িটাকে বুঝি কে সাজিয়েছে।

মা গেলে মায়া পড়াশুনো নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দু-বছরের মধ্যে একসঙ্গে স্কুল ফাইনাল আর সেক্রেটারিয়েল পরীক্ষা পাশ করে ফেলেছিল। মাঝে মাঝে মার খুদে বাড়িটার পাশ দিয়ে ঘুরে আসত মায়া। মিসেস জেকবস বলে একজন হাসিখুশি দক্ষিণী খৃশ্চান মহিলা থাকতেন তিনি ফুলে ফুলে বাড়িটাকে ভরে রেখেছিলেন।

নিজের নোটবই বের করে মায়া তারিখ মিলিয়ে ডাইরি আর হিসেব খাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে লিখে যেতে লাগল। মনে হল এ যার জীবনী তার নিজের তো কোনো সন্ধানই নেই ঐসব কাগজপত্রে। ঘটনা দিয়ে কি জীবনী হয় নাকি? আচ্ছা কতদিন লাগবে এই অদ্ভুত জীবনী শেষ করতে? তদন্ত শেষ হলেই হয়তো সেখান থেকে বলবে তোমার আর ওখানে থাকার দরকার নেই। ই-ই-ই-ক্! মায়া আঁৎকে উঠল।

দুটো ছোট ছোট কর্কশ হাত মায়ার চোখ টিপে ধরেছিল। হেসেই কুটোপাটি জনি। 'বল তুমি ভয় পেয়েছ মামি? ই-ই-ক করে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলে না?' মায়া তাকে কোলে টেনে

নিয়ে বলল, 'সত্যিই তাই যাচ্ছিলাম। বেজায় চমকে দিয়েছিলে।'

জনি বলল, 'আমি সবাইকে বলেছি আমার মামি ফিরে এসেছে। আমার জন্য প্রেজেন্ট নিয়ে এসেছে। কাল বই দুটো নিয়ে যেতাম কিন্তু বাড়ির জিনিস স্কুলে নিলে মিসরা রাগ করে। নিয়ে নেয় ফিরিয়ে দিতে চায় না।'

'খিদে পায়নি জনি?' জনি ওর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'পেয়েছে। কিন্তু এখন যে বাটলার ম্যাডামের চা দেয়। আমি পরে খাই।'

কিসের একটা ঢেউ মায়ার অন্তরকে প্লাবিত করল। ঢোক গিলে বলল, 'ইস তাই বুঝি? চল তো দেখি আমার সঙ্গে দেখি তুমি পরে খাও না এখনি খাও। তার আগে বরং হাত মুখ ধুয়ে এসো।'

জনি হাত-মুখ ধুতে গেলে মায়া কাগজপত্র তুলে রেখে ডি-সুজার কাছ থেকে জনির জন্য প্লেট বোঝাই কেক স্যাণ্ডউইচ এনে নিজের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। জনিকে ঘাড় থেকে নামাতে পেরে এরা সবাই খুব খুশী। ডি-সুজা নাকি আগে চৌরঙ্গীর কোন বড় হোটেলে কেক পুডিং তৈরি করত। ম্যাডাম ডাকতেই চলে এসেছিল। নাকি পর্তুগীজদের পরস্পরকে ঠেকা দিতে হয়

বিকেলের মিষ্টি রোদটুকু পাবার জন্য মিসেস গনজ্যালেজ তাঁর নিজের ছোট বাগানটিতে লোমের কম্বল দিয়ে পা ঢেকে বেতের গোল চেয়ারে বসেছিলেন। এখানে হিমালয়ের কনকনে বাতাস এসে পৌঁছয় না; বাড়ির দক্ষিণ কোণে আড়াল করা, ভারি আরামের জায়গাটি।

মায়া এসে পাশে বসতেই বললেন, 'সমস্ত জীবনটাই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে মায়া চোখ নেই তবু সব স্পষ্ট দেখতে পাই।' মায়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল 'এবেলা একটু ভালো লাগছে তো?' 'আমার আবার ভালো লাগালাগি কি মায়া? যখন যা বলি তাই হয়। কেউ বাধা দেয় না। বাধা দেবার কেউ নেই। সবাই যে যেখানে

পারে সরে পড়েছে। খুদে জনি ছাড়া। আমাকে দুঃখ দেবার কেউ নেই মায়া ভালো লাগবে না তো কি?'

তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন 'কাউকে ভালোবেসো না বুঝলে। যতদিন আমার ভালোবাসার মানুষ ছিল কেবলি দুঃখ পেয়েছি। এখন তারা সব খসে পড়েছে, আপদ গেছে। আসল দুঃখ কোথায় জান? আমাকে হিংসা করবার কেউ নেই, আমাকে 'হেট' করবার কেউ নেই। আজ আমি গজমতি পরেছি লক্ষ্য করেছ? একদিন আমার খানা কামরার ত্রিশটা চেয়ারের পনেরোটাতে বসে পনেরোজন মেয়ে আমার হীরে মুক্তোর দিকে চেয়ে পারলে আমাকে চোখ দিয়ে দগ্ধ করে ফেলতো। সেই ছিল আমার সবচেয়ে সুখের সময়। জনি কিছু বলে না আমার বিষয়ে?'

'কই না তো।' 'মেগ বলছিল তোমাকে নাকি ওর মা বলে টাউরেছে। তা তুমি কি আমাদের গোয়েনির মতো রূপসী? ওর মা লিখেছে দু-জন বেজায় বড়লোক ওর পিছন পিছন ঘোরে।' মায়া হঠাৎ সাহস করে বলে ফেলল, 'জনির বাবার কাছে ওকে দিয়ে দিলেই তো সব চাইতে ভালো হয়। তিনিই যখন ওর গার্জিয়ান।' বড়-মেম চটে গেলেন, 'কি যে বল! একজন ব্ল্যাক হিণ্ডুর কাছে জনি মানুষ হবে, সে ভাবা যায় না। তুমি কি করে কথাটা তুললে তাই ভেবে পাচ্ছি না। মেগকে ডাক আমার শীত করছে।'

বড়-মেম নিজের ঘরে চলে গেলে, মায়া গরম জামা গায়ে দিয়ে জনিকে সংগ্রহ করে, বেড়াতে বেরুল। 'জনি, হিল্‌-স্টোর বলে একটা দোকান আছে নাকি?' শুনে জনি মহা খুশী। 'আছে, মামি যাবে, সেখানে? এই বড় বড় কাচের গুলি পাওয়া যায়। তার ভিতরে রংচঙে সুতোর মতো কি।'

মনে পড়ল সেই গুলি একটা মস্ত বোয়মে সাজানো থাকত। কিছুই বদলায়নি তা হলে। খালি নিজে ছাড়া। তখন যেন এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচত। পরীক্ষা পাস করে একটা

জলপানি পেয়েছিল মায়া। কলকাতায় মিশনের হেপাজতে সেক্রেটারীর কাজের আরো ডিপ্লোমা নিয়েছিল। নিজে পড়ে বি-এ পাস করেছিল। তারপর এক বড় কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিল। একবারও এখানে ফিরে আসেনি। মিসেস অ্যাবট ছুটিতে কোন্নগরে গেছিলেন। ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই শেষ দেখা। মায়া মিশন ছেড়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল, সাড়ি পরা ধরেছিল, কপালে কুমকুমের টিপ দিয়েছিল। মাসি রেগে চতুর্ভুজ! 'বল কে তোমাকে কুপথে নিয়ে যাচ্ছে, মায়া? এতে তোমার সর্বনাশ হবে। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। আমি—আমি—' এই প্রথম মিসেস অ্যাবটকে কাঁদতে দেখেছিল মায়া। তবু তার মুখ দিয়ে একবর্ণ বাংলা বেরোয়নি। আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝে মায়ার সন্দেহ হয় ঐ কি তার সত্যিকার মাসি তাই কখনো হয়? মনটা বাথায় ভরে গেছিল। মুখে শুধু চাবী দিয়ে রেখেছিল। রবির কথা বলতে পারেনি। রবি তার সহকর্মী, তার ভালোবাসার মানুষ। ওর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

রবিকে বিয়েও করেছিল মায়া, এক বছর ঘরও করেছিল। ওর বাড়ির লোকেরা মিশনের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। রাহুল জন্মাবার আগে সেই যে রবি লক্ষ্ণৌ গেল মা-বাবার কাছে, আর ফিরল না। বিলেতে কি চাকরি নিয়ে চলে গেল। রাহুলকে মায়া একলা মানুষ করতে লাগল। একলা? না, একলা তো নয়। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটে পার্শী ভদ্রমহিলা বুড়ি মিসেস বোমানজি সারাদিন রাহুলকে রাখতেন, মায়া চাকরি করত। সেই মিসেস বোমানজি চোখ বুজলে পর রাহুলকে পাঁচ বছর বয়সে মায়া বোর্ডিং-এ দিয়েছিল। যাবার সময় রাহুল কেঁদেছিল, যেতে চায়নি। সেই কান্নার ঋণ এতদিন মায়ার মনে জমেছিল।

জান বলল, 'মাসি, তুমি কথা বলছ না কেন? কাঁদছ নাকি?' মায়া চোখ মুছে বলল 'কাঁদব কেন? চোখে হাওয়া লাগছে।' রবি

যাবার পর আর কাকেও ভালোবাসেনি মায়া। কাজে কেবল উন্নতি করেছে। ক্রমে নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব হয়েছিল। কাজে-কমে, বলতে হবে আনন্দেই বছরের পর বছর কেটে গেছে। যে কাকেও ভালোবাসে না তার আবার কিসের ভয়? খালি ঐ দুনিয়ার যেখানে যত ছোট ছেলে দুঃখ পায়, কষ্ট পায় তারা মায়াকে রাতে ঘুমোতে দেয় না, কেবলি ঘুমের ওষুধ খেতে হয়।

এ-রকম দোকান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সবুজ সদর দরজার ওপর গোলাপলতা উঠেছে। দরজা খুললেই ভিতরে টুংটাং করে ঘণ্টা বাজত। অমনি ভিতরের ঘর থেকে মুখ মুছতে মুছতে মিসেস অ্যাবটের বন্ধু মিস ফিলোমিনা হাসিমুখে বেরিয়ে আসতেন। হিসেব কষতে পারতেন না, যা তা বিল লিখতেন। খদ্দেররা সবাই তাকে জানত, বিল শুধরে টাকা শোধ করত। তিনি কি আর আছেন?

জনি ছুটে গিয়ে বেল টিপতেই সেই চেনা টুং-টাং সুর কানে বেজে উঠল। ভিতরের ঘরে কে যেন চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল। পরদা সরিয়ে মিস ফিলোমিনা হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন। মায়ার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। লোকে কত কি বলত, নাকি রোমান ক্যাথলিক নান ছিলেন, নানের জীবন সইতে না পেরে পালিয়ে গেছিলেন। কোন্নগরের পাদ্রীদের কাছে গিয়ে প্রোটেস্ট্যাণ্ট হয়েছিলেন। সেই ইস্তক মিসেস অ্যাবটের সঙ্গে ভাব। জনি কাচের ঝালরের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সার আব্দার শুনবার লোক নেই সে কার কাছে আব্দার করবে? মায়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঢুকে এক ডজন গুলি, এক ঠোঙা লজেঞ্জুস টফি কেনে দিল। জনির চোখ ছলছল করে উঠল, ফিকে একটু হাসল।

মিস ফিলোমিনার চোখদুটি চড়াইপাখির চোখের মতো চকচকে। গোলগাল বেঁটে মানুষটি বিল লিখতে দুটো ভুল করলেন। মায়া শুধরে নিয়ে টাকা দিতে গেলেই, খপ করে ওর হাতখান ধরে

বললেন, 'তোমাকে আমি নিশ্চয়ই চিনি।' মায়ার মুখ লাল হয়ে উঠল। কত লজঞ্চুষ খেয়েছে মিস ফিলোমিনার দয়ায়। 'ওটা গোয়েনের ছেলে না?'

জনি এগিয়ে এসে মায়ার হাত ধরে বলল, 'হ্যাঁ। আমার মামি ফিরে এসেছে। আমার জন্য প্রেজেন্ট আনতে গেছিল।' মিস ফিলোমিনা একটু হকচকিয়ে গেলেও, এককালে যারা ব্যর্থতার সমুদ্র লঙ্ঘন করে শুকনো ডাঙ্গায় এসে উঠতে পারে, তারা কতকগুলো নতুন শক্তি পায়। জনির চুল নেড়ে দিয়ে বললেন 'মিসেস অ্যাবটকে না দেখেই চলে যাবে নাকি?'

জনির হাত ধরে যন্ত্রচালিতের মতো মায়া মিস ফিলোমিনার সঙ্গে সঙ্গে পরদা সরিয়ে ভিতরের ঘরে গেল। সেখানে জানলার কাছে ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে যিনি শুয়ে ছিলেন তাঁকে মায়া খুব চেনে। তিনি মাথা ঘুরিয়ে মায়ার দিকে ফিরে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'মায়া আয় কাছে আয়, ভগবান আমার সব গর্ব খর্ব করে দিয়েছেন আমি উঠতে পারি না।' মিস ফিলোমিনাও বোধহয় বাংলা বোঝেন, ইংরিজিতে বললেন 'ল্যাণ্ডস্লাইডের সময় স্পাইন জখম হয়ে গেছিল। সরকার পেনশন দেয়।'

মায়া আস্তে আস্তে তাঁর পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ফিরবার সময় সমস্ত পথ মায়া জনির সঙ্গে গল্প করেছিল। মনের কোন সূক্ষ্ম বোধ ওকে বলে দিয়েছিল জনির অবচেতনায় একটা অস্বস্তি একটা নিদারুণ আশঙ্কা জমেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনে হাসতে হাসতে বাড়ি পৌঁছেছিল। মেগ নিচের ঘরে ছিল। বলল নাকি ফাদার চাওড়ি এসেছিলেন। সরকার থেকে ফল-বাগান নিয়ে নিচ্ছে, সে বিষয়ে কথা হয়েছে। ভালোই হবে ম্যাডাম কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। হীরে মুক্তো ঝাড়বাতি আর আবলুস কাঠের আসবাব খেয়ে তো প্রাণ বাঁচে না। মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা তো ভুলেও কোনো খবর নেয় না। হিল-ব্যাঙ্ক থেকে কড়া চিঠি

এসেছে অত খরচ করলে চলবে না। 'ডহবিল প্রায় চাঁচাপোঁছা। ম্যাডাম চিঠিটা ওয়েস্ট পেপার ব্যাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন, মেগ তুলে রেখেছে। বাস্তবিক ম্যাডামের এবার একজন অভিভাবকের দরকার হয়ে পড়েছে মিস পল আসাতে মোগের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে। গোয়াতে ওর ভাইবোনেরা থাকে, সেখানে ফিরে যেতে পারলে ও বাঁচে। কিন্তু জনির তো খাবার শোবার সময় হয়ে এল।

মায়া বলল, 'আমি দেখছি : তুমি বরং ম্যাডামের কাছে থাক। আছেন কেমন?' 'খুব ভালো। খুব খুশী। জনির টাকাগুলো এতক্ষণে বোধহয় মনে মনে খরচপত্র করে ফেলেছেন। ফাদার চাওড়ি ওঁকে দেখে গেছেন। বেশি কথা বলতে বারণ করে গেছেন। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, চিকেন স্যুপের সঙ্গে খাইয়ে দিয়েছি, নইলে খাবেন নাকি কখনো! বলেন ঘুম তো জীবন থেকে সময় চুরি করে নেয়, কেন ঘুমোতে বল? ভারি বাঁচার শখ। এদিকে তিরাশী বছর বয়স, চোখে প্রায় কিছুই দেখেন না বেঁচে থাকার কি দরকার তাও বুঝি না।'

ততক্ষণে জনির খাওয়া হয়ে গেছে, জনি নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছে। মায়া অবশ্য জানে যে মাঝ রাতে কখন উঠে আসবে সে। মায়া শুধু বলল, 'জনির একটা ব্যবস্থা না হওয়া অবধি ওঁকে বাঁচতেই হবে।' মেগ্ বলল 'ফাদার চাওড়িকে ম্যাডাম কি যেন বলেছিলেন পরে জনিকে ছেলেদের স্কুলের বোর্ডিং-এ দিয়ে দেওয়া হবে।' মায়া মুখ তুলে কর্কশ কণ্ঠে বলল, মিসেস গনজ্যালেজকে এতক্ষণ একা ফেলে রাখা আমাদের উচিত হচ্ছে না।' মেগ যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে বিদায় নিল।

মায়া ঘুমন্ত জনির খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বোর্ডিং-এ? যে ছেলে রোজ মাকে খোঁজে তাকে বোর্ডিং-এ? তাই কখনো হয়? উদ্ভ্রান্তের মতো ভাবতে লাগল কি করতে পারে। আসলে

এ-সব তার কাজ নয়। কিন্তু—কিন্তু ফাদার চাওড্রি নিশ্চয় একটা উপায় করে দিতে পারবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কোট পরে, মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে ডি-সুজাকে বলল, 'আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে আমার খাবার আমার ঘরের টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখো।' ডি-সুজা বলল, 'তা কেন মিস? আমার দশটা অবধি ডিউটি। বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে। আগে ম্যাডাম দশটার সময় ওভালটীন খেতেন।' হাসি পাচ্ছিল মায়ার। এ ক'দিন যাকে ভয়ে এড়িয়ে চলেছে, আজ কিনা নিজেই যেচে তার বাড়ি যাচ্ছে। বাড়ি অবিশ্যি ঠিক নয়। কারণ গির্জার পিছনে মিশনের ছোট অপিসের সঙ্গে লাগোয়া ঘরে ফাদার চাওড্রি বরাবর থাকতেন। এখনো তাই থাকেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। কেউ খালি হাতে কখনো ফিরত না তাঁর কাছ থেকে। যে যা চাইত তাকে তাই দিতেন। অন্যায় করলে বেজায় বকতেন, নাকি কঠিন সব সাজাও দিতেন। সতেরো বছরে কি মানুষের মন বদলায়? হয়তো অভ্যাস বদলায়, মায়ার যেমন বদলেছে। কিন্তু মন বদলায় কি? কই সেই যে কিশোরী মায়ার মন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াত, যা খুঁজছে তা পেত না কি খুঁজছে বুঝতে পারত না। এখনো তো এই চৌত্রিশ বছরের আধ-বুড়ো মায়া তেমনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ঐতো ফাদার চাওড্রির ঘরে আলো জ্বলছে। পাশেই একটা নতুন লম্বা ঘর সেখানে লোক আছে বোঝা গেল।

অর্কিড ঝোলানো বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে ফাদার চাওড্রি নিজেই বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় ঝোলানো ছোট্ট আলোর নিচে দাঁড়ানো মায়াকে দেখে বললনে 'এসেছ তাহলে মায়া! ভাবছিলাম কবে আসবে।'

মায়া বলল, আমি—আমি—আপনি—ফাদার চাওড্রি বললেন, 'আর বলতে হবে না আমি সব জানি। পাছে চিনে ফেলি, তাই

আস নি তো ? সলোমন চেনা লোকের সামনে দেখা দিতে বারণ করেছিল, এই তো ? ওর বোধহয় ভয় আমি তোমাকে চিনতে পারলে ওর চোরা-কারবারি তদন্ত সব নস্যাৎ হয়ে যাবে। ওর আর পদোন্নতি হবে না—সে যাক গে। আজ তোমাদের বাড়ি গেছিলাম জান তো ? এখানে মস্ত অর্চার্ড হবে, তিনশো বেকার ছেলে খাটবে ফ্রান্সিস্কোর পেনশান হবে, নতুন কমিটি বসবে, বিশেষজ্ঞরা এসেছেন কাগজপত্র দেখতে মাপযোক করতে—ভালো খবর না ?"

মায়া আধা হেসে আধা কেঁদে বলল, 'খুব ভালো খবর।'

ফাদার চাওড়ি বললেন, 'কিছু ভাবনায় পড়েছ না ? এসো আমার ঘরে।'

ঘরটির তেমনি আছে, কাঠের টেবিলে কয়েকটা বেতের চেয়ার দেয়াল-ভরা বই তালাবন্ধ লোহার আলমারি। সতেরোটা বছর যেন কিছুই নয়। মায়া কম্পিত পদে ফাদার চাওড়ির পাশে বসে একবার ঢোক গিলে তাঁকে গত সতেরো বছরের ইতিহাস বলে ফেলল। কিছু বাদ দিল না।

সব শুনে মৃদু হেসে চাওড়ি বললেন 'এ-সবও কি তোমার তদন্তের মধ্যে পড়ে নাকি ? বলেছে না সলোমন এখান থেকে নেপালে তিব্বতে যাওয়া ভারি সহজ, ছোট জায়গা কারো নজরে পড়ে না একটা থানা পর্যন্ত নেই এখান থেকে চোরা-চালানের যেমন সুবিধা তেমন আর কোথাও নেই। নিরীহ নাগরিক সেজে আইন ভঙ্গকারীরা নির্বিঘ্নে বছরের পর বছর ব্যবসা চালাচ্ছে—কেমন এ-সব বলেছে কিনা সে ? স্বীকার কর যে আরো বলেছে যে ঐ গনজ্যালেজদের পূর্ব পুরুষেরা বোম্বেটে ছিল, তাদের বংশধররা সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে আর এইখানে সকলের দৃষ্টির আড়ালে ওদের পুরনো একটা ঘাঁটি।'

মায়া দু হাতে চোখ ঢেকে বলল, "আপনি কি সবজান্তা ? ..... কিন্তু জনির কি হবে ? 'কেন জনির একটা ব্যবস্থা না হওয়া অবধি

তুমি তাকে আগলাতে পারবে না? ছোটবেলা থেকে তো খুব মনের জোর দেখিয়েছ। মিসেস অ্যাবাট...।' এই বলে ফাদার চাওড্রি থামলেন। উঠে পড়ে বললেন, 'এইসব হাত-বদলের ব্যাপার চুকলে ওষুধপত্র নিয়ে লম্বা ট্রেকে চলে যাব পাহাড়ের মধ্যে। ও হ্যাঁ, জনির কথা বলছিলে না? ম্যাডামের কোনো খেয়াল নেই তাই তার বাবাকে খুঁজে আনতে হবে? দেখি কি করা যায়। কিন্তু ম্যাডামেরো যে একটি দেখাশুনোর লোক দরকার সেটা লক্ষ্য করেছ? চল তোমাকে পৌঁছে দিই।'

বাইরে বেরিয়ে ফাদার চাওড্রি বললেন, আমাদের নতুন অফিসটা দেখে যাও। বারো বছর ধরে বাগানটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে এসেছি, এখন যদি সত্যি দাঁড়ায়।'

মনে আছে ছোটবেলায় টিচাররা বলতেন, 'সতেরো বছরের বেশি বয়সের কোনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বাপ-মায়ের ঘাড়ে বসে খায় না। যারা কলেজে পড়তে যায় তাদের কথা আলাদা যারা খুব বড়লোক তাদের কথাও বাদ। কবে বিয়ে হবে বলে কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। এ মেয়েরা কাজের মূল্য জানে। সবাই কাজ করে নিজের খরচ চালায় তাতে কোনো লজ্জা নেই, বরং সম্মান আছে বাস্তবিকই তাই।

ঐ দুটি স্কুলে কত রকমের কাজ শেখানো হত। ডিপ্লোমা নিয়ে কেউ বসে থাকত না। কত জায়গায় ওরা কত ভালো কাজ করেছে। মিসেস অ্যাবট কেবলি বলেছেন কাজ কর, কাজ কর কাজের মতো কিছু নেই। নিরাশা ক্ষতি ব্যর্থতার সময় থাকে না সর্বদা কাজ করলে। দেখ না আমি কেমন কাজ করি। কোথাও এতটুকু ফাঁকা থাকলে অমনি সেটা কাজ দিয়ে ভরে দিই। এই ছত্রিশটা ঝাড়নে দেখ তো শুতে যাবার আগে ক্রস-স্টিচ দিয়ে স্কুলের নাম লিখে দিতে পার কিনা। —হ্যাঁ যা বলছিলাম অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সর্বদা কাজ করে। যীশুর তাই নির্দেশ। অবিশ্যি আমি

লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলেদের কথা বলছি না—লাল সুতো নাও, মায়া ডবল করে তাহলে ছিঁড়বে না।"

'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান' শুনে মায়ার একটু হাসি পেয়েছিল। 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান' আবার কি শতকরা নব্বই জন তো মায়ার চেয়েও ঢের কালো। তবে এ-কথাও সত্যি যে গায়ের রং দিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয় না। ও একটা মনের অবস্থা একটা দৃষ্টিভঙ্গী। ওদের দেখাদেখি মায়াও সমস্তক্ষণ কাজ করত। কাজ করতে ভালো লাগত। ওদের গল্প শুনতে মজা লাগত। কি নিখুঁৎ সেলাই বোনাইয়ের কাজ করত ওরা, কি খাসা কেক বিস্কুট তৈরি করত। স্বচ্ছন্দে দুই স্কুলের রুটির চাহিদা মেটাত। কি ফুর্তিতে কাজ করত। আর কেবলি বয়ফ্রেণ্ডদের-গল্প আর সাজগোজের চিন্তা। অথচ কোথায় যে বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে দেখা হত, একটুখানি লিপস্টিক কিনবার পয়সাই বা কোথায় জুটত ভেবে পেত না মায়া।

প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার ছুটি থাকত। সেদিন পালা করে দল বেঁধে দু-একজন টিচারের সঙ্গে কুড়িজন মেয়ে হেঁটে মোটর রোডে গিয়ে সারা দিনের মতো পাহাড়ের সদর শহরে কাটিয়ে আসত। বড় মেয়েরা সারা সপ্তাহের কাজের জন্য হাতখরচ পেত তাই দিয়ে এটা ওটা কিনে আনত। ছোট মেয়েদের প্রতি মাসে দুটো টাকা হাত-খরচ দেওয়া হত তাই দিয়ে যা হয় কিনত। ঐ দিনটি ছিল যেন একটা বিশেষ উৎসবের দিন। মায়া যখন মার কাছে ছিল, তখন সব পয়সা মার হাতে দিয়ে দিত। কি সামান্য মাইনে পেত মা, কি-ই বা কাজ জানত লেখা-পড়ার ধার ধারত না। মিসেস অ্যাবট বলতেন 'ঐ স্কুল ফাইন্যালটা দিয়ে, এখান থেকে টিচার্স ট্রেনিংটা নিয়ে নিলে আর তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না।'

মার কোনো উৎসাহ ছিল না। তখন তিনি বলতেন 'না হয় ক্লাশ এইটের বার্ষিক পরীক্ষাটা দাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাহলে জুনিয়র ট্রেনিংটা নিতে পারবে। মা খালি বলত, 'আমার

একটা ছেলে থাকলে এত কষ্ট সইতে হত না' মিসেস অ্যাবট রেগে যেতেন, 'তাই না আরো কিছু ছেলেটা বখে যেত!'

এ দেশী খৃশ্চানরা তখন গাউন পরলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয়ে যেত। তবে গোয়েন সত্যিই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিল। ছেলেদের স্কুলে ক্লাশ টেনে একটা ছেলে ছিল চমৎকার ক্রিকেট খেলত সে-ই নাকি গোয়েনের বয়-ফ্রেণ্ড। পড়াশুনাতেও খুব ভালো ছিল, গার্ডনিং-এর ক্লাসে সোনার মেডেল পেয়েছিল। পরে পাস করে, স্কলারশিপ পেয়ে কোথায় যেন চলে গেল। মায়া আর তাকে দেখেনি লম্বা কোঁকড়া চুল ছেলে ভারি ভালো দেখতে রংটাও বেশ কালো। কিন্তু কে-ই বা তেমন ফরসা ছিল। কত ছল করেই না গোয়েন তার সঙ্গে দেখা করত। এদিকে বাড়িতে গ্র্যাণ্ড-মাদার তো জানতে পারলে আস্ত রাখবেন না। গোয়েনের তাই বড় ভয়, নাকি কলমের এক আঁচড়েই গোয়েনকে নিঃস্ব করে দিতে পারেন। বড় বড় চোখ করে বলত গোয়েন, 'ভালোবাসাই বল আর যাই বল, টাকার কাছে কিছু নয়। টাকা থাকলেই সব হয়। আমার গ্র্যাণ্ডমাদার এক রকম এখানকার এম্প্রেস এ-কথা নিশ্চয় মান? ঐ তো গির্জার অমন বিদ্বান ছোট পাদ্রীর ওপর চটে দিল তো তাকে বিদায় করে। কে কি করতে পারল? লোকেল লোকরা কেউ ওর সঙ্গে মিশবার যোগ্য নয় বলে কেমন দিব্যি একলা থাকে! একটু ডাকলেই কেমন চল্লিশ মাইল দূর থেকে সব নেমন্তন্ন খেতে ছুটে আসে। দুঃখের বিষয় ঐ ছেলেটার টাকাকড়ি কিছু নেই। নাকি মা বাপ মরা দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করা ছেলে কে জানে! কিন্তু মুখটা কি মিষ্টি বল দিকিনি। চেটে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।'

হাঁ করে মায়া ওর কথা শুনত। ভাবত সত্যি ঐ ছেলেটা বড় ভালো, সর্বদা ফার্স্ট হয়। গোয়েন তাকে গোলাপী খামে করে ছোট ছোট সুগন্ধী চিঠি পাঠাত। সে কোনো উত্তর দিত না। এ-

সব তো মাত্র উনিশ বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে গোয়েন কোথা থেকে কোথায় ছিটকে পড়েছে, রেখে গেছে ঐ দুঃখী ছেলেটাকে আর মায়া ও দুঃখের দুস্তর পারাবার পার হয়ে সেই ছেলেটার কাছে এসে পড়েছে।

ফাদার চাওড্রির কাছ থেকে ফিরে আসতেই গরম খাবার দিয়েছিল ডি-সুজা। ম্যাডাম নাকি শুধু স্যুপ আর পরে একটু পুরানো ব্র্যাণ্ডি চেয়ে খেয়েছিলেন। এ-সব ব্র্যাণ্ডি বাড়ির নিচেকার সেলারে ম্যাডামের বিয়ের সময় থেকে জমা আছে। কত বড় বড় লোকে তার সুখ্যাতি করে গেছে। চেখে দেখবেন মিস একটু? মায়া চেয়ে দেখে ছিল, আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন কত বছরের কত পুরনো সুখ গালিয়ে রুবির মতো গায় লাল এই পানীয় তৈরি হয়েছে। আস্তে আস্তে মায়া মাথা নাড়ল। সুখের সঙ্গে তার কি?

মনে হল এই সুন্দর ছোট্ট শহরটা দুঃখীদের জায়গা। ঐ বড় বড় স্কুল দুটি দুঃখীদের জন্য তৈরি হয়েছিল। যাদের মা বাবা নেই, কিংবা থেকেও নেই তারাই ওখানে আসত। বাকিরা ছিল মুষ্টিমেয়। এখন বোধহয় সেটা পাল্টে গেছে। এখন স্কুল চালায় সরকার তার কাছে সুখী-দুঃখী বলে কিছু নেই। এখানে একটাও সুখী পরিবার ছিল না। মা-বাবা ছেলে মেয়ে আর মাথার ওপর একটা ছাদ, দু-বেলা দুটি করে গরম খাবার, রাতে গা গরম করার লেপ সুখী হতে আর কি চাই? তাও ছিল না এদের। খাওয়া-শোয়ার কষ্ট ছিল না কিন্তু মাথার ওপর নিজেদের বলতে একটা ছাদ ছিল না। তাই খালি বলত ওরা কবে বড় হবে, কবে রোজগার করার ক্ষমতা হবে, কবে এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাব।

কিন্তু মায়ার সুখ ছিল। মা ছিল আর মিসেস অ্যাবট এক রকম বলতে গেলে মায়ার বাপের-ই মতো ছিলেন। মিসেস অ্যাবটের গাউন-পরা গোলগাল চেহারাটা মনে পড়তেই মায়ার হাসি পেল।

যাকে মিস ফিলোমিনার বাড়িতে দেখে এল, সে কিন্তু অন্য মানুষ। ফাদার চাওড়ি মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসে বলতেন 'সব এক। কাপড়-চোপড় ছাল-চামড়া দিয়ে শুধু তফাৎ। ভিতরে সব এক, এক রক্ত-মাংস হাড়, মন্ত্র-তন্ত্র তার আবার প্রায় সবটাই জল দিয়ে তৈরি, পোড়ালে এক মুঠো ছাই!'

স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস বুড়ি মিস্ মাইলস বলতেন, 'একজন খৃশ্চান পাদ্রীর মুখে ও আবার কেমন কথা!' ফাদার চাওড়ি কার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে হাসতেন। 'খৃশ্চান-ই বা মন্দ কি, পোড়ালে সব এক। কে হিন্দু কে খৃশ্চান বোঝবার জো থাকে না। যুদ্ধের সময় দেখে এসেছি।' নাকি ডাক্তারিতে খুব নাম-ডাক হচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সব ছেড়েছুড়ে এই সেবার কাজে লাগলেন, অথচ কিছু নাম লেখানো পাদ্রীও নন! কি করে চলে কে জানে। স্কুল দুটো থেকে নিশ্চয় একটা মাসোহারা দেওয়া হয়, খায়দায় শীতে গায়ে কম্বল দেয় তো মানুষটা। তিন-চার মাস অন্তর দুটো কুলির মাথায় ওষুধের গাঁটরি আর দুস্থ গ্রামবাসীদের জন্য কিছু গরম জামাটামা নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান। দিন পনেরো বাদে ফিরে এসে আবার কাজে লেগে যান। ওষুধ কেনার টাকা কে দেয়? চাঁদা তোলেন কি? হয়তো মিসেস গনজ্যালেজের মতো লোকেরা নিজেদের আত্মার সদ্গতির জন্য ঘৃণিত গরীব গ্রামবাসীদের ওষুধে আর গরম জামা কেনার টাকা দেন। কিন্তু আগে না হয় তারা দিত, এখন তো তারা সব অন্য দেশে চলে গেছে এ-দেশের লোকেরা ও-সবে বিশ্বাস করে না! মায়া হঠাৎ সটাং হয়ে উঠে বসল তবে কি—মিঃ সলোমনের কথাই ঠিক। বলেছিলেন এখানে এমন কেউ আছে যাকে সবাই বিশ্বাস করে, সম্ভবতঃ বহু বছরের বাসিন্দা, সে-ই এই চোরা চালানের পাণ্ডা। এছাড়া হতেই পারে না। স্রোতের মতো কোনো গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে চোরাচালানি চলেছে। সেটা বন্ধ

করতেই হবে। ওখানে তোমার সব চেনা-জানা। অথচ এত বছর পরে দরকার হলে নিজের পরিচয় গোপনও করতে পারবে, যেমন এই যেখানে তোমার চাকরি ঠিক করা হয়েছে এই মিসেস গনজ্যালেজ ওল্ড পর্তুগীজ ফ্যামিলির মেয়ে। নেটিভদের ওপর হাড় চটা, চোখে ভালো দেখেন না সাদা-কালো সব সমান। একটু চটপট ইংরিজি বললেই ভাবেন বুঝি পর্তুগীজদের বংশধর। এই যেমন আমি। উনিই যদি মক্ষিরাণী হন আমরা একটুও আশ্চর্য হব না। ওঁর বাড়িতে বসে তদন্ত করবে। এই বলে মিঃ সলোমনের কুচকুচে কালো মুখ হাসিতে ভরে গেছিল।

'দেখ, কতটা কি পার। এ-কেসটা বাগাতে পারলে তোমার খুব ভালো একটা উন্নতি হবে, মিসেস্ পাল। তোমার মতো বুদ্ধিমতী কর্মী মেয়ে-পুলিশে কেন পুরুষদের মধ্যেও একটাও আছে কিনা সন্দেহ।'

সব অলীক স্বপ্ন! বুদ্ধি? শুধু বুদ্ধি দিয়ে কি হয়? মায়ার বুদ্ধি এখন বলছে—এই তো পেয়েছে। এতে আর সন্দেহ কি! আরেকটু তদন্ত কর বুড়ো এখনো তো এখানে আছে। ট্রিক-এ বেকলে পেছনে গুপ্তচর লাগাও 'কোডে' একটা টেলিগ্রামের ওয়াস্তা!

এই তো চেয়েছিল মায়া। কাজ। কাজে উন্নতি। মনটনের ধার ধারে না মায়া, তাই তো কাজে এত মনোযোগ তার। তো মায়া বলে কাজের মতো আছে কি, কাজের ওপরেই জীবনের প্রতিষ্ঠা।

জনি কখন এসে মায়ার খাটে শুয়েছে। মায়া তাকে জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে। মায়ার বুকের মধ্যে কাজের তালে চাপা পড়া একটা অচেনা সত্তা বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছিল।

কি করে ঘুমোয় রাতে মায়া? মনে পড়ল মা যখন বেঁচে ছিল ফাদার চাওড্রির একশো রকম ছোট ছোট দয়ার কথা স্নেহের কথা বলত মা ওঁকে খুব একটা পছন্দ করত না বলত নাকি

নিজে খৃশ্চান হয়ে সবাইকে খৃশ্চান করতে চায়। কিন্তু খৃশ্চান হবার কথা কোনো দিনও মুখে বলেন নি ফাদার চাওড়ি। যদি দুঃখীর দুঃখ দূর করা বঞ্চিতের অভাব মেটানো রুগ্নের সেবা করা খৃশ্চানি হয়ে থাকে তাহলে তার চাইতে ভালো আর কিছু নেই। তবু মায়া এ-সবে বিশ্বাস করত না কিবা হিন্দু, কিবা খৃশ্চান, সব সমান। নিচের মানুষটার নাগাল পাওয়া বড় শক্ত।

মা মারা গেলে মিসেস অ্যাবেট কাঁদতে বসেছিলেন তখন ফাদার চাওড়ি মায়াকে নিয়ে মিস্ মাইলসের জিম্মা করে দিয়েছিলেন। তখনো এটা একটা মিশনারি প্রতিষ্ঠান ছিল অবিশ্যি বিলেত থেকে সামান্য টাকাই আসত। ফাদার চাওড়িরা আপ্রাণ কষ্ট করে চাঁদা তুলতেন। সরকার নিয়ে নিলে সকলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কত স্কুল কত হাসপাতাল মিশনারিরা করেছিলেন কত ভালো কাজ হয়েছিল সেখানে। এখন আস্তে আস্তে তার মেজাজ বদলে যাচ্ছে। তবু ভালো কাজ হল ভালো কাজ। ফাদার চাওড়ি দুঃখীদের বাপ।

কিন্তু—কিন্তু কি করে উনি মিঃ সলোমনের কথা জানলেন? অফিসে নিশ্চয় ওঁর চর আছে। কে হতে পারে?—হাই তুলে হঠাৎ মায়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে আবার অত দ্বিধার কি আছে?

পরদিন সকালে এতটুকু সময় পেল না মায়া। জনিদের স্কুলে খেলা-ধুলোর পুরস্কার বিতরণ। জনি 'মাঙ্ক ট্রিকস'-এ প্রথম পুরস্কার পাবে। তার মামি না গেলে কেমন করে হয়।

চলে গেছিল মায়া মিসেস্ গন্‌জ্যালেজের অনুমতি ছাড়াই। তাকে পেল কোথায় যে অনুমতি নেবে। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেম সেজেই গেছিল, কেউ অবাক হয় নি। দেখল গত সতেরো বছরে স্কুলটার কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেই 'বয়েজ হোম' 'গার্লস হোম' সাইনবোর্ড দুটি নেই তার জায়গায় লেখা 'হিল স্কুল বয়েজ' 'হিল স্কুল গার্লস' আর আজকের বিশেষ দিনটিতে ছাদের ওপর উঁচু দণ্ডে

ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে ভারতের তে-রঙা পতাকা উড়ছে। বাইরের খোলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান। বড় শীত।

দর্শক বলতে বাইরের কেউ নয়—ছোট জায়গায় বাইরের কেই বা আসবে—শুধু দুই স্কুলের ছেলেমেয়েরা কিছু অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষিকা আর ফাদার চাওড্রির দল। তাতেই আসর জমে উঠেছে। চেয়ে দেখলে মায়া একটিও চেনা মুখ দেখতে পায় কিনা। কাউকে পেল না মেয়েদের স্কুলের কয়েকজন শাড়ি-পরা মহিলা। দেখে বুঝতে পারল দিন কত পালটে গেছে। ফলত: মুখ খুঁজতে হয়।

একটা গান কিছু ব্যায়াম খেলাধুলো কিছু বক্তৃতা। যিনি সভাপতি তিনি নিশ্চয় রাজনৈতিক কোনো নেতা, অতিথিরাও সাজগোজ করা যিনি পুরস্কার বিতরণ করবেন তিনি ওঁর স্ত্রী হবেন। একপাশে হাসিমুখে ফাদার চৌধুরী তাঁর সঙ্গে ছয়-সাতজন বিশিষ্ট অতিথি। সকলেরই রঙ কালো। ফলবাগানে পরীক্ষাগার খোলার ব্যাপারে এসেছেন, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ সব। তাদের মধ্যে একজনকে কেমন একটু চেনা-চেনা মনে হল। নইলে সব নিয়ে এই শ'তিনেক মানুষের ভিড়ে ফাদার চাওড্রি, মিস ফিলোমিনা আর জনি ছাড়া কাকেও মায়া চিনতে পারল না।

জনি আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। মেগ্ কোথা থেকে গাঢ় নীল কোট, পুলোভার আর লম্বা পেন্টেলুন বের করে দিয়েছে। লাল-নীল ডোরাকাটা টাই বেঁধেছে জনি জুতোয় পালিশ পড়েছে। শেষের দিকে ছোট মানুষটি যখন বাও করে, একটা বড় দো-রঙা ফুটবল পুরস্কার গ্রহণ করল মায়ার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মনে হল ফাদার চাওড্রির দলও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জনিকে দেখছে। আর সে কি হাততালি। ভোরের দিকে রোদের মতো ক্ষীণ একটু হাসি জনির ঠোঁটে ফুটে উঠে, ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে তুলল। আনন্দের চোটে বলটাকে বুকে চেপে, লাইন ভেঙ্গে 'মামি! মামি!' বলে ডেকে মায়ার কোলে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। বহু অচেনা মুখ ঘাড় ফিরিয়ে মায়াকে দেখবার চেষ্টা করল।

সভা ভেঙ্গে গেলে ফাদার চাওড্রি এগিয়ে এসে জনিকে অভিনন্দন করলেন। এ যেন এক নতুন জনি। কারো পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল না।

সুন্দর দিন করেছিল; পাহাড়ের মাথায় লাল ছাদের বাড়িটি রোদে ঝলমল করছিল। গনজ্যালেজ উঠে সামনের লনে আরাম-কেদারায় বসেছেন দেখে মায়া কত নিশ্চিন্ত হল। ফাদার চাওড্রি যে জনির একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন সেবিষয়ে মায়ার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহলেও ম্যাডামের সেরে ওঠা চাই।

এই প্রথম ম্যাডাম জনিকে ডেকে তার বলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলেন। মায়া ভাবল, ম্যাডাম সাকল্য ভালোবাসেন। ম্যাডাম জনিকে বললেন, 'আরো কাছে এসো।' বলে ওর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে যেন চেহারাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। মায়াকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার চেয়ে ফরসা নাকি।' মায়া হেসে বলল, ঢের ফরসা।' 'আমার চেয়ে?' মায়া চাটুকারের মতো বলল, 'ইংল্যাণ্ডের রানীও আপনার চাইতে ফরসা নয়।' কথাটা কিন্তু সত্যি। ম্যাডামের হাত কাঁপতে লাগল। আনাড়ির মতো গলা থেকে মুক্তোর মালা খুলে জনির হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রীর জন্য রেখে দিও।'

জনি বলে বসল, 'আমার মামিকে দেব।' বলে মায়ার হাতে গুঁজে দিল। মায়া ভয়ে কাঠ। মিসেস গনজ্যালেজ বললেন, 'আবার মা পেয়েছ বুঝি? তোমার কপাল ভালো। আমার মাকে হারাবার পর, আমাকে ভালোবাসার আর লোক পাইনি।—মায়া আজ তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। দোতলা ছেড়ে দিয়ে নিচের পুবের বড় গেস্টরুমে থাকতে পারবে তো? জনি সঙ্গে থাকলে আশা করি কষ্ট হবে না? ব্যাঙ্ক থেকে মিঃ গডফ্রে কি ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন মেগের কাছে শুনো। আমি বড় ক্লান্ত, সব কথা বলতে পারছি না, তবে আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই।'

কুশনে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলেন বড়-মেম। মায়া উঠে পড়ল, 'আমিও ভিতরে যাই লাঞ্চের আগে যতটা পারি কাজ এগিয়ে রাখি।'

জনি মহাখুশী। মামির সঙ্গে বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ঘরে থাকতে পাবে শুনে সে আহ্লাদে আটখানা। কতবার যে শুপর-নেচ করল তার ঠিক নেই। গোলাপী দেয়াল, ঘি-রঙের ব্রকেডের পরদা, বড় সুন্দর দক্ষিণমুখী ঘরখানি। বদ্ধ ঘরের সাঁৎসেঁতে ভাব দূর করবার জন্য চিমনিতে আপেল কাঠের আগুন জ্বালা হয়েছে। মিস-সুজা বলল, এর জন্য আপেল কাঠই সবচেয়ে ভালো মিস ভারি সুগন্ধী। গদী-তোষক সব রোদে দিয়েছি। এ-ঘরে ছোটলাটসাহেবকে আর তাঁর স্ত্রীকে আমি থাকতে দেখেছি। এই বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড বের করে দিয়েছিলাম। এগুলো ইংল্যাণ্ডে তৈরি, হরকুলের জিনিস। সেখানেও আর এমন হয় না।' গলার আওয়াজটা বড় করুণ শোনায়।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মায়া বলল, 'সবই বদলে যায় মিস-সুজা, নইলে প্রোগ্রেস হবে কি করে?' জনি ঘরে ঢুকে বলল, 'সর, সর! মামি এই নতুন বইদুটোর জায়গা হবে তো?' মায়া হাসল, 'সব জিনিসের জায়গা হবে, জনি, কত বড় ঘর দেখেছ?' মেগ্‌ও হাত লাগাবার জন্য ঘরে এল। 'মুক্তোগুলো খুব মূল্যবান, তুলে রাখলেই ভালো হয়, মিস।' জনি বলল, 'না আমার মামি পরবে। আমি দিয়েছি।'

পরে মেগ বলল, 'ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ গডফ্রে এসেছিলেন অনেকক্ষণ ছিলেন। পয়সা-কড়ির কথা বলছিলেন। সরকার থেকে দোতলাটা ভাড়া নেবে। চার্টের নতুন ডিরেক্টর মিঃ রয় থাকবেন। সব যেমন আছে তেমন থাকবে, খালি খুচরা জিনিস সব সরাতে বলে গেছেন। ভারি ভারি আসবাব ছাড়া নেই-ও তো কোনো খুচরা জিনিস! আমরা নিচের তলাতেই বেশ আরামে থাকতে পারব। ম্যাডামের অর্থচিন্তা ঘুচবে।'

মায়া ভাবল, এ-ও নিশ্চয় ফাদার চাওড্রির কাজ। মনে হল খুঁজে দেখলে দেখা যাবে এখানকার অধিকাংশ ভালো কাজের মূলেই বুড়ো ফাদার চাওড্রি। মা বলত চাওড্রি আবার একটা পদবী হল নাকি ? নিশ্চয় চৌধুরী। বাঙ্গালীর ছেলে খৃশ্চান পাদ্রী হয়ে ফাদার চাওড্রি বনে গেছে। হাসব, না কাঁদব !

দুপুরে মিঃ সলোমনকে একটা লম্বা এবং সম্ভবতঃ অপ্রত্যাশিত চিঠি লিখেছিল মায়া। বিকেলে জনিকে নিয়ে মিসেস অ্যাবটকে দেখতে গেছিল। সব কথা তাঁকে বলেছিল। জন তার নতুন বল নিয়ে পাশের বাড়ির সহপাঠীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। ফিরে এসে বলল, 'মামি সব বাঁশগাছে ফুল ফুটেছে দেখে এলাম।'

মিস ফিলোমিনা একটা ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে জনির হাত মুছিয়ে একটুকরো ঘরে তৈরি কেক গুঁজে দিয়ে বলল, 'তার মানে সবগুলো মরে যাবে। বাঁচা যাবে। বাঁশঝাড়ে সাপের বাসা হয় পাশ দিয়ে যেতে ভয় করে। মায়া, তুমি জানো ত বাঁশগাছে পঁচিশ-ত্রিশ বছর, কি তারো বেশি দিন বাদে ফুল হয় আর ফুল হলেই গাছ মরে যায় ?' মায়া কথাটা শুনেছিল বটে, মনে ছিল না।

নতুন ভাড়াটেকে মিসেস গনজ্যালেজ সমারোহ করে অভ্যর্থনা করেছিলেন। নিচের বড় বসবার ঘরের ঐশ্বর্যের মাঝখানে বসিয়ে ডি-সুজার হাতে তৈরি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী খাইয়েছিলেন।

লোকটি মায়ার অচেনা নয়। মায়ার মনে পড়ে গেল এই গোয়েনের সেই পুরনো বয়-ফ্রেণ্ড। নাম নাকি ডঃ রয়। ভারত সরকার থেকে পাঠিয়েছে গবেষণাগারটাকে চালু করে দেবার জন্য। তাহলে অন্ততঃ বছর পাঁচেক থাকতে হবে। এক-একটা ছোট আপেল গাছ বড় করে না তুলে যাবেনই বা কি করে ?

রাতে জনি মায়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ড্যাডি কি একলা উপরে শোবে ? শুনে মায়ার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল। এই তবে উত্তর। এই জন্য অত নামকরা বিশেষজ্ঞ এখানে এসেছেন।

ধাঁধার টুকরোগুলো পর পর ঠিক জায়গায় পড়ে কেমন সুন্দর এক ছবি হয়ে গেল। এঁরই সঙ্গে বিলেতে গোয়েনের দেখা হয়েছিল এঁকেই গোয়েন বিয়ে করেছিল এঁকেই ত্যাগ করেছিল—গোয়েনের মতো মেয়েরা বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কেমন করে সুখী হতে পারে? জনির জন্যেই নিশ্চয় এখানে আসা। যাক, ভালোই তো মায়ার যা কাম্য তাই হয়ে গেল।

সকালে জনিকে নিয়ে মায়া ওপরে গিয়েছিল। সে দৃশ্যের কথা ভাবা যায় না। বিকৃত স্বরে 'ড্যাড' বলে চেঁচিয়ে জনি ডঃ রয়ের গা বেয়ে উঠে পড়েছিল। তাঁর ঘন কালো চোখ জলে ভরে এসেছিল। মায়াকে বলেছিলেন, 'তুমি জানতে মায়া? তুমি জানতে না? তোমাকে চিনতে পারছি গোয়েনের সঙ্গে তোমার ভাব ছিল। এখন একে নিয়ে কি করি বলতো। জনি, তোমার ড্যাডিকে এখনো মনে আছে?'

অনাথ ছেলেমেয়েদের গল্প এটা এর শেষটাতে সুখ থাকবেই হবে। সুখ সুখ করে যারা দুনিয়া হাতড়ে মরে, তারা সুখ কোথায় পাবে? আর যারা ছোটবেলা থেকে বঞ্চিত তারা সুখের [illegible] স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলে বুকে করে রক্ষা করবে চ তারা জানে সুখ বলে কিছু নেই, নিজের মনের ভিতর থেকে সুখ এনে আশ্রয়হীন পৃথিবীতে ঢালতে হয়।

পরদিন ডঃ রয় মিসেস গনজালেজের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'জনি আমার ছেলে, আমার কাছে কাগজ পত্র আছে। আমি ওর ভার নিতে চাই। আপনি যা করেছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার গায়ের রং কালো, আমি অনাথ, এই হিল-স্কুলে লেখা-পড়া শিখেছিলাম।' মিসেস গনজ্যালেজ বলেছিলেন, 'আমি সব জানি। ফাদার চাওড়িকে আমি বলেছিলাম তোমাকে খুঁজে এনে দিতে। এখানে থাকো। আমার সময় হয়ে এসেছে। একা মরতে চাই না। ভাবতাম

আমার অসীম শক্তি। দেখছি আমি দুর্বল! মরবার সময় নিজের লোকের কাছে মরতে ইচ্ছা করে।'

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েও ছিল। এই ঘটনার এক মাস পরে, বাগানে বসে সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মিসেস গনজ্যালেজ স্বর্গে গেছিলেন। যদি স্বর্গ বলে আলাদা কোনো জায়গা থাকে।

তারও পরে একটা সুখের দিনে মায়ার সঙ্গে ডঃ রয়ের বিয়ে হয়েছিল। এমনি করে জনি তার মা-বাবা ফিরে পেয়েছিল। মিসেস অ্যাবটের শেষ জীবনটা মায়ার কাছে কেটেছিল। গল্পের শেষে সবাই সুখী হয়েছিল, থালি মিঃ সলোমন চটে কাই। তাঁর সব চাইতে ভালো 'পুলিশ উওম্যান' কিনা তদন্ত করতে গিয়ে চাকরি ছেড়ে বিয়ে করে বসল। যদিও তাকে মিছিমিছি পাঠানো হয়েছিল ওখানে কোনো সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আর কাদার চাওড়ি? তিনি এ-সবের কথা জেনেছিল অনেক দিন পরে সব চুকেবুকে গেলে পর। ততদিনে গবেষণার কাজ পুরোদমে চলেছিল।

মেগ মোটা পারিশ্রমিক নিয়ে গোয়া চলে গেছিল। ডি-সুজার আসল বাড়ি নাকি এই পাহাড়ে, সে আরো দশ বছর কাজ করবার শক্তি ধরে। সাঁইলাকে বই বাঁধাই কাজ শিকতে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল। বড়মেম উইল করে জনিকে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী করে গেছিলেন। বাঁশ গাছ সব সত্যি মরে গেছিল।